



মাসিক
আলোকধারা

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

রেজিঃ নং চ-২৭২
২৫তম বর্ষ
দশম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১৯ ইসাহী





১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রবিবার, বাদ আসর: 'পালকি পার্টি হল', জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, ইউ এস এ আহলে সুনাত ওয়াল জামাত ইউ এস এ কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত আহলে বাইত-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মরণে 'পবিত্র শাহাদাতে কারবালা মাহফিল'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন 'তুরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীয়া'র বিশ্বসমাদৃত বর্তমান শাইখ মাইজভাণ্ডার শরিফ 'গাউসিয়া হক মনজিল'এর সম্মানিত সাজ্জাদানশীন এবং শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট (SZHM Trust)-এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি, রাহবার-ই আলম হযরত শাহসুফি আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মাদাজিল্লুহুল আলী)।



৫ সেপ্টেম্বর'১৯ শুক্রবার নগরীর 'রীমা কনভেনশন সেন্টার'এ মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ-এর শাখা কমিটি সমূহের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন ২০১৯-এ।



হাঙ্কুল ইবাদ: গত ৪ অক্টোবর ২০১৯ শুক্রবার 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট' পরিচালিত 'দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প'র উদ্যোগে 'সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা' কার্যক্রমের আওতায় ৭টি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের অংশ হিসেবে ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চন নগরে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, মানিকপুর শাখার তত্ত্বাবধানে "সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (রঃ) দাতব্য চিকিৎসালয়"-এর কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন ফটিকছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব হোসেন মোহাম্মদ আবু তৈয়ব।



২৯ আগস্ট ২০১৯ SZHM Trust নিয়ন্ত্রণাধীন মহিলা সংগঠন 'আলোর পথে' আয়োজিত মাসিক মাহফিলে "পবিত্র আশুরা ও আহলে বাইত (দ.)-এর মর্যাদা" বিষয়ে আলোচনা করছেন গোমদণ্ডী দরবার শরিফের নায়েবে সাজ্জাদানশীন ও কর্ণেলহাট গাউসুল আযম জামে মসজিদের সম্মানিত খতীব মাওলানা সৈয়দ আহমদুল হক মাইজভাণ্ডারী।



'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'-এর উদ্যোগে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র ৩১তম উরস উপলক্ষে ৭ দিনব্যাপী কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে ৫ অক্টোবর শনিবার চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ মহিউদ্দিন।

মাসিক

আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং চ ২৭২, ২৫তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০১৯ ঈসায়ী

সফর-রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী

আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৬ বাংলা

প্রকাশক

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র রক্ত ও তুরিকতের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী প্রদত্ত দলিলমূলে, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের খেদমতের হকদার, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের হকদার, শাহী ময়দান ব্যবস্থাপনার হকদার-মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানশীন

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক

ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

যোগাযোগ:

লেখা সংক্রান্ত: ০১৭৫১ ৭৪০১০৬

০১৭১৬ ৩৮৫০৫২

মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০

০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা \$=2

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫



এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর পক্ষে

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি প্রকাশনা

Web: www.sufimaizbandari.org.bd

E-mail: sufialokdhara@gmail.com

সূচী

- সম্পাদকীয় ----- ২
- নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটে হযরত শাহসুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) প্রদত্ত অভিভাষণ ----- ৩
- বেলায়তে মোত্লাকা
খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)
প্রথম পরিচ্ছেদ
সুনতে ওজমা ----- ৭
- বেলায়তে মোত্লাকার অনন্ত পথের দিশারী হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) : নীরবতাই যার ঐশী অলংকার
আলোকধারা ডেক্স ----- ১২
- শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) স্মৃতিবিজড়িত ১৩ অক্টোবর এবং তাঁর বহুত্ববাদী আদর্শিক উত্তরাধিকার মোঃ মাহবুব উল আলম ----- ১৫
- শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) মানবতা, সম্প্রীতি ও মানব কল্যাণের বিশ্ববাতিঘর
আলোকধারা বিশেষ প্রতিবেদন ----- ১৮
- উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)
মোঃ গোলাম রসুল ----- ২৪
- নবী-রাসূলের জীবন প্রবাহে তাসাওউফ ধারা
অধ্যাপক জহুর উল আলম ----- ২৮
- জীবনালেখ্য
তাসাওউফের সাধক কবি দার্শনিক শেখ সাদি (র.)
অনুবাদ ও পুনর্ভাষ : ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ ----- ৩৫
- নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম
আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল ----- ৩৭
- ফীহি মা ফীহি
মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর (র.) উপদেশ বাণী ----- ৪১
- শিশু-কিশোর মাহফিল
মহান আল্লাহকে যেভাবে পেলেন নবী হযরত ইব্রাহীম (আ.)
----- ৪৫
- পাঠক পর্যবেক্ষণ : যুগ ও জাগতিক সংকট এবং ফিকাহবদ ফকিহদের লাগাতার নিরবতা ----- ৪৭

সম্পাদকীয়

আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটস্ 'পাল্কি পার্টি হল' এ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রবিবার রাতে অনুষ্ঠিত শাহাদাতে কারবালা মাহফিলে তুরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীয়ার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) প্র-প্রপৌত্র, 'তুরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীয়ার' বিশ্বসমাদৃত শাইখ ও মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ 'গাউসিয়া হক মনজিলের' সম্মানিত সাজ্জাদানশীন, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট (SZHM Trust)-এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি, রাহবার-ই আলম হযরত শাহসুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) (মওলা হুজুর) অভিভাষণ প্রদান করেন। যুগের দিগনির্দেশনা প্রদানকারী এই অভিভাষণটি একটি মূল্যবান সংযোজন।

বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ মহান আল্লাহুতায়ালার অশেষ রহমতে বাংলা সাধু বাক-রীতি থেকে চলিত বাক-রীতিতে রূপান্তর এবং সারানুবাদের প্রয়াস মুদ্রিত আকারে সম্পন্ন হলো। তাসাওউফের বিশ্বজনীন দর্শন ও বেলায়তের অনন্ত অভিযাত্রার গভীর গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে এমন অসাধারণ বিশ্লেষণ কোথাও মিলে না। মানব জগতের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ নবুয়ত ও বেলায়তের ঐশী আশির্বাদ ও তাঁর নানা স্তর এবং রুহানি অভিযাত্রার সবকিছুরই সারনির্ঘাস এই পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে। মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা এবং এই পবিত্র বেলায়তের দর্শন ও স্বরূপ উন্মোচনে বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে অনন্য ও অতুলনীয়। জ্ঞান-সাগর মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার রুহানি ভাষ্যকার, অসি-এ গাউসুল আযম ও অলি-আল্লাহু খাদেমুল ফোকারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর পবিত্র কলমে এই গ্রন্থটি তাসাওউফের অর্গলমুক্ত যুগের পবিত্র দীপশিখায় পরিণত হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় দরদন্নাত উপদেশনা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শে ঐশি আশীর্বাদের ছায়া দিয়েছেন পরম শ্রদ্ধেয় মাওলা হুজুর গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.জি.আ.)।

মহান ২৯ আশ্বিন গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবাজাণ্ডারীর (ক.) পবিত্র খোশরোজ শরিফ। এই উপলক্ষে তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'বেলায়তে মোতলাকার অনন্ত দিশারী হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) ॥ নীরবতাই য়ার ঐশী অলংকার ॥' লেখাটি আলোকধারা ডেস্ক থেকে প্রকাশিত হলো। বিশ্বজগত থেকে মহাজগতব্যাপী ব্যাপ্ত মানবকূলের কল্যাণের দিশারি মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার দীপ্তিমান পবিত্র আলো শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উরস মোবারক ২৬ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর তারিখ অনুসারে এবার যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অগনিত মুরিদ ভক্ত অনুরক্ত শাহানশাহ (ক.) এর স্নেহসিক্ত দোয়া লাভকারী মানুষের ঢল তাই তাঁর পদধূলিতে ধন্য পবিত্র হক মনজিল অভিমুখে। এই পবিত্র উরস উপলক্ষে আলোকধারায় তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাপা হলো বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক এবং তুরিকত গবেষক মোঃ মাহবুব উল আলমের লেখা 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) স্মৃতি বিজড়িত ১৩ অক্টোবর এবং তাঁর বহুত্ববাদী আদর্শিক উত্তরাধিকার'।

শাহানশাহ (ক.) এর পবিত্র শান বেলায়তের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও দোয়া প্রার্থনা করে আলোকধারার এই সংখ্যায় মুদ্রিত হলো বিশেষ প্রতিবেদন 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) মানবতা, সম্প্রীতি ও মানব কল্যাণের বিশ্ব বাতিঘর'। এর কারণ ঐশি রহমতের ধারার সন্ধান তাঁর কাছেই মিলে। তিনি বিশ্বব্যাপী মহান আল্লাহর মঙ্গল ও শৃংখলা বিতরণকারী অলি হিসেবে নিজেকে বিস্তৃত করেছেন। সেই সাথে এই প্রতিবেদনে যুক্ত হয়েছে তাঁর পবিত্র জীবনপঞ্জি।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ.) এর জীবনে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে অন্যতম উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)। এই পবিত্র মহিযসী

নারীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সংখ্যায় লিখেছেন শাহানশাহ (ক.) এর একনিষ্ঠ ভক্ত মোঃ গোলাম রসুল। মহানবী (দ.) এর উম্মতকূলের জন্য শুধু নয় বিশ্বের মানব সমাজের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, জ্ঞানচর্চা এবং বিতরণের এক অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি উম্মতকূলের পবিত্র মা হযরত আয়েশা (রা.) এর জীবনে খুঁজে পাওয়া যায়।

'নবী-রাসূলের জীবন প্রবাহে তাসাওউফ ধারা' শিরোনামে পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য প্রামাণ্যের আলোকে এক গভীর তাত্ত্বিক দর্শন সমৃদ্ধ লেখা এই সংখ্যায় দিয়েছেন অধ্যাপক জহুর উল আলম। তাঁর লেখায় আল্লাহুতায়ালার সাথে নবী-রাসূল ও পবিত্র মানবাত্মার সৃষ্টি-সৃষ্টি সম্পর্কের অনেক মহৎ দিক উন্মোচিত হয়েছে। তিনি পবিত্র কুরআনের আলোকে বলেন, 'আল্লাহর নির্দেশ প্রদানের পরও 'আজাজিল' আদমকে সিঁজদা না করায় সে আদেশ লংঘনকারী, অহংকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়। আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টির অহংকার করা হারাম তথা অবৈধ। অহংকার দেমাগ মুতাকবিবরী আল্লাহর সৌন্দর্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। আর সৃষ্টির জন্য এগুলো হচ্ছে অমার্জনীয় অপরাধ।'

কবি, দার্শনিক, মানবহিতৈষী এবং সুফি সাধক পারস্যের এক অনন্য সাধারণ মনীষা হযরত শেখ সাদি (র.)। তাঁর বহুমাত্রিক সাহিত্যিক প্রতিভা পারস্য তথা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক বড় ধরনের বিস্ময়। মধ্যযুগে জনগ্রহণ করেও তিনি বিশ ও একশ শতকের আধুনিক জামানতেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সহ বিশ্বের সর্বত্র আলোকিত ও সমাদৃত। তাঁর কাব্যরচনা, জীবনালেখ্য নিয়ে এখনও চলছে ব্যাপক গবেষণা।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ.) কে নিবেদিত তাঁর অবিস্মরণীয় নাতে রাসূল 'বালাগাল উলা বি কামালিহি/ কাশাফা দুজা বি জামালিহী' বিশ্বের সর্বত্র নবীপ্রেমী মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে পরম শ্রদ্ধায় আবৃত্ত ও গীত হয়। এই দার্শনিক, সুফি কবির কাব্য 'গুলিস্তান' থেকেও ভাবনির্ঘাস এবং উদ্ধৃতি মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার পবিত্র দার্শনিক ও তাত্ত্বিকগ্রন্থ হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) রচিত 'বেলায়তে মোতলাকা'য় উদ্ধৃত হয়েছে। রুহানি পবিত্র জ্ঞান কী ভাবে স্থান-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করে আল্লাহুতায়ালার রহমতের ছায়ায় চিরকালিন ও চিরবিদ্যমান হয় 'বেলায়তে মোতলাকা'র মাধ্যমে এই গভীর বিষয়টির পরিচয় মেলে। আলোকধারা'য় এই সংখ্যায় তাই শেখ সাদি (র.) এর জীবনালেখ্য, তাঁর জীবন ও সাহিত্যের সংশ্লেষে মুদ্রিত হলো।

আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল রচিত ধারাবাহিক রচনা 'নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম' এই সংখ্যায় যথারীতি মুদ্রিত হলো। আধুনিক জীবনে আজ নারী জাতির কর্ম উদ্যোগ ও বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। দেশের কৃষি, শিল্প, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারী সমাজের অংশগ্রহণ বাড়ছে। কিন্তু তারপরও নৈতিক-আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবে এই সমাজে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁদের যথাযথ প্রাপ্য বৃষ্টিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের গাফেলতি দেখা যায়। মূল্যবোধের এই অবনতি অবস্থায় এই লেখায় সম্প্রতি নারীর অধিকার ও ইসলাম এই দৃষ্টিকোণ থেকে নানা মাত্রিক আলোকপাত করা হয়েছে। বিষয়টি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে পাঠক মহল এই লেখাটির মাধ্যমে আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠতে পারবেন বলে আশা করা যায়। সমাজে মহান আল্লাহর রহমত, শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় এ ব্যাপারে সবার মনোযোগ স্থাপন সময়েরই দাবি বৈকি।

এবারের আলোকধারায় শিশু-কিশোর মাহফিলে মুদ্রিত হলো 'মহান আল্লাহকে যে ভাবে পেলেন নবী হযরত ইব্রাহীম (আ.)'। এ লেখাটি প্রশ্ন এবং উত্তর এই রীতিতে তৈরি হওয়ায় সোনালী বন্ধুদের জন্য অনুধাবনে অনেকটা সহজসাধ্য হবে।

বর্তমান সময়ের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে একটি পাঠক পর্যবেক্ষণ 'যুগ ও জাগতিক সংকট এবং ফিকাহবিদ ফকিহদের লাগাতার রহস্যপূর্ণ নিরবতা' শিরোনামে এই সংখ্যায় মুদ্রিত হলো।

নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটে হযরত শাহসুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) প্রদত্ত অভিভাষণ

আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ ‘পাল্কি পার্টি হল’এ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রোববার রাতে অনুষ্ঠিত ‘শাহাদাতে কারবালা মাহফিলে’ তুরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীয়া’র প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) প্র-প্রপৌত্র, ‘তুরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীয়া’র বিশ্বসমাদৃত শাইখ ও মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ ‘গাউসিয়া হক মনজিলের’ সম্মানিত সাজ্জাদানশীন, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট (SZHM Trust)-এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি, রাহবার-ই আলম হযরত শাহসুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) (মওলা হুজুর) প্রদত্ত অভিভাষণ

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকীন,
ওয়াল সালাতু ওয়াল সালামু আলা সাঈয়্যিদিল মুরসালিন,
ওয়াল আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আহলে বাইতিহি আজমাঈন,
আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাযীম
বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আহলে বাইতে রাসূল (সা.) স্মরণে শাহাদাতে কারবালা মাহফিল, ‘আহলে সুনাত ওয়াল জামাত ইউএসএ কেন্দ্রিয় কমিটি’ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই আজিমুশ্ শান মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জুবায়ের আহমদ, উপস্থিত প্রধান বক্তা আহলে বাইত মিশন মসজিদের ইমাম ও খতিব আল্লামা মুফতি সৈয়দ আনসারুল করীম আযহারী, আল্লামা মোদাচ্ছের হোসেন নকশবন্দী কাদেরী, আল্লামা মাসুদ ইকবাল, আল্লামা মুফতি ড. সৈয়দ মোতাওয়াক্কীল বিল্লাহ রব্বানী সহ অসংখ্য ওলামায়ে আহলে সুনাতের মুরুব্বিয়ানে কেলাম এবং আহলে সুনাত ওয়াল জামাত কর্মকর্তাবৃন্দ (এই সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ), আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের আক্বিদার অনুসারীবৃন্দ, আহলে তাসাওউফ ও তুরিকতের অনুসারীবৃন্দ সহ উপস্থিত সকলকে জানাই ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু’। সকলকে সালাম জানিয়ে আমার সামান্য বক্তব্য আমি উপস্থাপন করতে চাই। রাত অনেক হয়েছে শুরু থেকেই আল্লামা ড. মোতাওয়াক্কীল বিল্লাহ, মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আযহারী সহ বক্তারা যে ভাবে আহলে বাইতে রাসূলের তাজকেরা

করলেন, বিশেষ করে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তারপরে নূতন করে কিছু আলোকপাত করার প্রয়োজনও নেই, সুযোগও নেই। আমি ব্যক্তিগত সফরে এখানে এসেছি – যখনই শুনলাম, এখানে একটি মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং তা আগে থেকে হয়ে আসছে, তার দাওয়াত পেয়ে উপেক্ষা করতে পারি নি।

মনে করেছি দূর দেশে আপনারা বাংলাদেশ থেকে এসে আমেরিকার অধিবাসী হয়ে এদেশকে গড়ে তুলছেন, বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছেন, তারপরেও ঈমান-আক্বিদার প্রতি যে তাগিদ আপনাদের ভিতরে কার্যকর, আমাদের মূল-উৎসের প্রতি আপনাদের যে প্রেরণা-তাড়না, সত্যকে তুলে ধরার, সত্যকে মেনে চলার, সত্যের প্রতি আস্থান করার যে প্রেরণা আপনাদের ভেতর জাগ্রত রয়েছে, তারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ আজকের এ শাহাদাতে কারবালা মাহফিল। এতো ব্যস্ততার মধ্যেও আপনারা এসেছেন, তুরিকতের বিভিন্ন সংগঠন এখানে সমবেত হয়েছে বিশেষ করে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি, বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আশেকদের সংগঠন, তারা নানা জায়গা হতে উপস্থিত হয়েছে, গাউসিয়া কমিটি উপস্থিত হয়েছে, আহলে বাইত মিশন উপস্থিত হয়েছে, যাঁরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ।

আমি গুনাহগার গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দরবার পাকের পক্ষ থেকে এ তুরিকতের একজন খাদেম হিসেবে শাহাদাতে কারবালা মাহফিলের সাথে আমার একাত্মতা ঘোষণার জন্যই মূলত এসেছি। আমি আশা করি, এই শাহাদাতে কারবালা মাহফিল চলমান থাকবে, আশুয়ান থাকবে

প্রতিবছর বৃহৎ আকারে। এখানে যে আপামর জনসাধারণ রয়েছে, শুধু বাঙ্গালী নয়, আমাদের হয়তো আরো বৃহত্তর পরিসরে চিন্তা করতে হতেও পারে, বরং করা উচিত বলে মনে করি।

কারবালার জমিনে যে মর্মস্তুদ ঘটনা, যার জন্য আমরা রোদন করি, ক্রন্দন করি, আমরা ভাবিত হই- সে বিষয়টিকে আমি দেখেছি- আমরা চিরাচরিতভাবে মুহররম আসলে শোকাহত হই, একটি অত্যন্ত শোকাবহ পরিবেশের মধ্যে থাকি। যদিও আমরা জানি, এ দিনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়েছে। সবগুলো শোকাবহ নয়, অনেকগুলো আনন্দেরও সংবাদ। কিন্তু কারবালায় হযরত হোসাইন রাডিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের যে ঘটনা, আহলে বাইতের ত্যাগের এই যে মর্মান্তিক ঘটনার মধ্য দিয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতনের যে ইতিহাস, তার পূর্বাপর ঘটনা থাকলেও সে গুলোকে ছাপিয়ে আমাদের মনে স্থান করে নিয়েছে সেই ত্যাগের মহিমা। যদিও আশুরা, কারবালার পূর্ববর্তী চিন্তা-চেতনায় এবং পরবর্তী কালের ঘটনায় তাৎপর্যবহ হয়ে রয়েছে। কারবালার পর থেকে আশুরার দিন একটা নতুন ডাইমেনশন (মাত্রা) লাভ করে, যা উম্মাহর চিন্তা-চেতনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

আমি দেখেছি, এক শ্রেণীর লোক কারবালা ও আশুরা বলতে, হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত যে সংকটমুক্তির ইতিহাস – সেই ইতিহাস এবং সর্বশেষ পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন মদিনায় হযরতের পর ইছদীরা আশুরায় রোযা রাখছেন দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেন রোযা রাখছেন? তারা বলল- এই দিনে-আশুরার দিন বিশেষ করে মূসা (আ.) মুক্তি লাভ করেছিলেন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর উপর অধিক হকদার। আমরা রোযা রাখব এবং একটি বেশি রোযা রাখার নির্দেশনা দিয়ে দিলেন। আমরা দেখেছি, এক শ্রেণীর মুসলমান এতটুকুর মধ্যে শেষ করে দিতে চায়। কিন্তু আমি দেখেছি, দেশ-বিদেশের বক্তারা তা এড়িয়ে যেতে চান। এর মধ্যে দুটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে। একটি হলো কারবালার পূর্ববর্তী মাত্রা, আর একটি হলো কারবালার পরবর্তী মাত্রা। এটি আজকে আমাদের আলোচনায় ভেসে উঠেছে যে কারবালার ভিতরের যে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের চেতনা, আদর্শের চেতনা আমাদেরকে শত শত বছর, যুগের পর যুগ উজ্জীবিত রেখেছে, হোসাইনী চেতনা, সেই চেতনাকে নির্মূল করার – বিনষ্ট করার একটা কৌশল হিসেবে আমার মনে হয়েছে। আমাদের আজকের প্রধান বক্তা বলেছেন যে, আহলে বাইতে রাসূল (দ.) এর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের নানা

আয়োজনকে তারা ভাল চোখে দেখছেন না। অথচ হক আর বাতিলের পার্থক্য হচ্ছে শাহাদাতে কারবালা।

খারেজিয়তের পরিচয় হচ্ছে শাহাদাতে কারবালা, হোসাইনী চেতনাকে বিনষ্ট করার। এজিদের বাহিনীর যে আচরণ, প্রতিপক্ষকে নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল করার যে আচরণ, নিজেকে যে কোন মূল্যে বিজয়ী করার যে আচরণ, যে কোন মূল্যে নিশ্চিহ্ন করার যে আচরণ; সত্যকে চাপিয়ে রাখার-লুকিয়ে রাখার যে আচরণ তা খারেজিয়তের একটি বৈশিষ্ট্য, অন্যায়-অত্যাচার যা আজকে আমরা দেখছি। এই উপস্থাপকও বলেছেন, কেউ হযরত ওয়াইস করনী (রা.)'র মাযারে যাচ্ছে, অন্যের তা পছন্দ হচ্ছে না, সে বলেছে, গুড়িয়ে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও। চাপিয়ে রাখার যে আচরণ (নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যে মানসিকতা) -এই যে খারেজিয়তের স্বভাব যেটি আমরা কারবালার ময়দানে দেখেছি। এই স্বভাবটিই তারা বহন করেছে। এ জন্যে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'এজিদি মুসলমান' আর 'হোসাইনী মুসলমান'। আমরা হোসাইনী মুসলমান। আরো একটি আলোচ্য বিষয় এখানে এসেছে, মুসলমানরা নির্যাতিত, নিপীড়িত। মুসলমানরাতো বিশ্বকে সংকট হতে মুক্তি দেয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত উম্মাহ্। মুসলমানদের মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমরা তো ব্যর্থ হচ্ছিই, আবার আমাদের সাহায্য করতে, উদ্ধার করতে অন্যান্য উম্মাহর এগিয়ে আসতে হচ্ছে। কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। এই অবস্থার অবসান প্রয়োজন এবং সে অবসানের সূত্রটিও আজকের আলোচনায় এসেছে। আর তা হলো আমাদের ঐক্য প্রয়োজন। ঐক্য শব্দটি শুনতে খুবই সুন্দর, কিন্তু কি ফর্মুলায় এই ঐক্য সম্ভব তাও আবিষ্কার করা দরকার। কেননা, আমরা দেখেছি সুফিদের মধ্যে, তুরিকাপন্থী সংগঠনের মধ্যে নানা ধরনের বিভক্তি। একজনের কালচার হয়ত ভিন্ন, আর একজনের হয়ত ভিন্ন চিন্তাধারা-ভাবনা, কিন্তু তার সাথে আমার মিলাদুল্লবী (দ.), শবে কদর, শবে বরাত সব কিছুতে মিল। মিলাদ-কিয়াম, ফাতেহা সব মিল কিন্তু কোন একটি বিষয়ে তার সাথে আমার অমিল রয়েছে। এখন সময় হয়েছে এই সব গুরুত্বপূর্ণ অমিলগুলোকে দূরে ঠেলে, এমনকি যদি গুরুত্বপূর্ণ মনেও হয় তবে ঐক্যের স্বার্থে সেগুলোকে দূরে ঠেলে আমাদের ঐক্যের বার্তা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আর আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে অন্যজন আহত হয়। আমার মনে হয়েছে, আমাদের চট্টগ্রামে যে কোন একটি লিফলেটে, এখানেও নারায়ে তকবির-আল্লাহ্ আকবার, নারায়ে রিসালাত-ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলার পর নারায়ে গাউসিয়া-ইয়া গাউসুল আযম- লিখেন নি, হতে পারে যে এখানে কাদেরীয়া,

গাউসিয়া-ইয়া গাউসুল আযম- লিখেন নি, হতে পারে যে এখানে কাদেরীয়া, নকশবন্দীয়া সহ বিভিন্ন তুরিকার অনুসারী আছে তাই এটি বাদ দিয়েছেন। যাতে অন্যরা আহত না হয়। এটি একটি সতর্কতা হতে পারে। একটা তুরিকার যে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ, তা অন্য তুরিকার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। নাও মিলতে পারে, তখন আমাদের এই সব উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে। এগুলোকে হিসেবে আনাই হল বড় কথা। আমি জানি না এটা কেন? আমি চট্টগ্রামের বিভিন্ন মসজিদে দেখেছি, আমরা জুমার নামাযে মায়ানমারের কথা বলি, কাশ্মিরের কথা বলি, তারা দুঃস্থ, নিপীড়িত, অত্যাচারিত সবই ঠিক আছে, কিন্তু ইয়েমেনের জন্য, যেখানে হাজার হাজার মুসলমান মৃত্যুবরণ করছে, তার জন্য কিছু বলি না। যে ইয়েমেনের জন্য রাসূল (স.) দোয়া করেছেন। সে নিপীড়িত মানুষের জন্য দোয়া করতে আমি শুনি নি। এরকম কেন হচ্ছে? তাদের আমরা ভুলেই গেছি। এ ব্যাপারে আমরা 'ডি-সেন্ট্রালাইজড' হয়ে গেছি। আসলে সময় তো পরিবর্তন হয়ে গেছে। (আসলে আমি জানি না)। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ এটি আমার সিদ্ধান্ত নয়, বরং অবজারভেশন মাত্র। জানি না, ওলামায়ে কেরাম চিন্তা করবেন কিনা। করা উচিত বলে আমি মনে করি। মুসলিম দেশে এক কালচার, আপনাদের এ দেশের আরেক কালচার। আমি যদি বলি, ওপেন সোসাইটি আর ক্লোজ সোসাইটি। আমরা তুরিকতের সংগঠনগুলোর মধ্যে পরস্পর সহজ হতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে, এমনকি আমরা 'পয়েন্ট অব নো রিটার্নে' চলে গেছি এবং একটি অদৃশ্য দেয়াল আমাদের ছোট ছোট দ্বীপ করে রেখেছে। এই অদৃশ্য ব্যারিয়ারগুলোকে আমাদের কমিয়ে ফেলা উচিত। এর জন্য চিন্তা করা উচিত। 'তার সাথে আমার মিলছে না' এটা আমি কিভাবে কমিয়ে আনতে পারি? ঐক্যের স্বার্থে তা ভাবতে হবে। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত আসলে কোন সংগঠন নয়, এটি একটি আক্বিদার নাম। এমন না যে, কেউ এই সংগঠনের সদস্য না হলে সে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী হবে না। বিষয়টি এরকম নয়। সে আক্বিদাকে আপনারা সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, আমি মনে করি, আজকে যেমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হচ্ছে, এখানে ওলামায়ে কেরাম এসেছেন, বাংলাদেশীরা এসেছেন তেমনিভাবে এখানে টার্কিশরা আছেন, তাঁদের ইনভাইট করতে পারেন। আরবের কিছু স্কলাররা এখানে আছেন, তাঁদের ইনভাইট করতে পারেন। শাহাদাতে কারবালা, আহলে সুন্নাহ ও তুরিকত

পন্থীদের আক্বিদা, এসব চর্চা করতে পারেন - নব প্রজন্মের জন্য এগুলো বুঝার-জানার চেষ্টা আমরা করতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা উলামায়ে কেরামদের পেয়েছি, মুরব্বীদের পেয়েছি, আপনারাও পেয়েছেন, আমরা একটা পর্যায়ে এসেছি। এখন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য করতে হবে। আমরা বাংলাদেশে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একভাবে চিন্তা করি। কিন্তু এখানে (ইউ এস এ) সেরকম চিন্তা করলে হবে না। তাঁদেরকে বুঝানোর জন্য আপনাদেরকে এখন থেকে কাজ করতে হবে। এখানে সবাই বাংলাদেশের অরিজিন, তাই বলছি, তাঁরা কি ভাবে আহলে বাইত, আহলে তাসাওউফ, আহলে সুন্নাহর বিষয়সমূহকে ধারণ করবে। তার উপযোগী করে তাদের সামনে উপস্থাপনের জন্য আমাদের কী করণীয় সেটি নিয়ে আমাদের চিন্তা ও কাজ করা দরকার। তার জন্য আপনারা বৃহত্তর পরিসরে সবাইকে ডেকে শুধু শাহাদাতে কারবালা মাহফিল নয়, বছরের নানা সময় চিন্তা-চর্চার কাজটি করতে পারেন। তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক বিশাল খেদমত হবে বলে বিশ্বাস করি।

এখন এক কঠিন সময় যাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশ থেকেও তা বুঝতে পারি, উলামায়ে কেরামও বলেছেন আজকের বক্তব্যে। কত রকমের ফেতনা এই যুগে চলছে। আমাদের সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, যেগুলো কোন দেশ বা সময়ে নির্দিষ্ট নয়। আপনি কিছুতেই এটাকে বাধা দিতে পারবেন না। এটা খুবই কঠিন, আপনি সব কিছু বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থাকবেন, সে উপায়টি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এই অবস্থার মধ্যে ঈমান-আক্বিদা কেমন করে বাঁচবে? কেমন করে চলবে? আমি এটা এখানে বলছি, কারণ আপনারা ফাস্ট ওয়ার্ল্ডে বসবাস করেন। আপনারা অনেক অগ্রসর, আপনারা যদি এসব একটু গুছিয়ে নিতে পারেন এবং দেশের মানুষের সামনে যদি আপনারা এগুলো উপস্থাপন করতে পারেন, তবে দেশের মানুষ ও নবপ্রজন্ম উপকৃত হবে। আমি জানি না, আমি মনের ভাবটি বুঝাতে সক্ষম হয়েছি কিনা? আমি উলামায়ে কেরাম-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ সময় হয়ে গেছে ব্যস্ত। আগে সারা রাত মাহফিল হতো, এখন চট্টগ্রামেও সারারাত মাহফিল কয়টি হচ্ছে জানা নাই, কয়দিন পর হয়ত তাও দেখা যাবে না। এখানেও আপনারা আজকে অনেক কাজ-কর্ম ফেলে, সময় কুরবানী দিয়ে এসেছেন, আহলে বাইতের স্মরণে আপনারা দুনিয়াবী-বিষয় কাজকে কুরবানী দিয়েছেন, এটিকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছিয়ে দেয়ার জন্যে, তারা যাতে তাদের মনের গভীরে লালন-ধারণ

করতে পারে। তার জন্য আসলে কিভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে সামাজিক কর্মসূচি হিসেবে, তা আমার জানা নেই। তবে ইনশাআল্লাহ, সামনে যদি সুযোগ হয় তবে আমিও আপনাদের সাথে শরিক-শামিল থাকব, যদি আপনারা মনে করেন যে, মুরব্বিদের সাথে বসবেন, আহলে তাসাওউফ পন্থীদের সাথে বসবেন, সবার সাথে বসবেন।

শুধু আমাদের বাংলা ভাষাভাষী নয়, মানবিক সমস্যা সবার জন্যই একই। আরব-অনারব, ভারত, পাকিস্তান সবার জন্যই একই। সবাইকে নিয়ে আমরা বৃহত্তর আহলে সুন্নাহর যে পরিবেশ-প্রতিবেশ, যে জনগোষ্ঠী, সেটিকে ধীরে ধীরে আমরা ইনভলভ করতে পারি কিনা তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। কেমন করে করা যায়? এই চিন্তা-চেতনা আমাদের ছড়িয়ে দিতে হবে। আরো ইমাম-খতিব-মসজিদ আমাদের লাগবে। সেগুলো কি ভাবে হবে? আমি দেখেছি এখানে টার্কিশ অনেক মাদ্রাসা-শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে রকম বাংলাভাষা-ভাষীদের জন্য কি ভাবে করা যায়? আহলে তাসাওউফ ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারীদের পক্ষ হতে এই কথাগুলো বলছি। সে জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনের দিকে চিন্তা করে বলছি। তাদের জন্য যে মডিউলটা, যে ঈমান-আক্বিদাগত শিক্ষা ব্যবস্থাটা কি ভাবে আমরা গড়ে তুলতে পারি? যদি এটা করা হয়ে থাকে তবে 'আলহামদুলিল্লাহ'। আর যদি না হয়ে থাকে তবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয় হতে পারে।

আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমাকে সম্মান জানানোর জন্য, একজন দরবারে পাকের আওলাদ হিসেবে। মূলত আপনারা আমার মাধ্যমে হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-কে সম্মান জানিয়েছেন। আমিও আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি। শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আশেকগণ তুরিকতের খেদমত করে যাচ্ছে। মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি নামে তাঁরা সারা দেশে ও দেশের বাইরে আছে। 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এটি আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতেও পাবেন, দেখবেন। আলহামদুলিল্লাহ, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর আশেকদের প্রচেষ্টায় এই ট্রাস্ট এর কার্যক্রম চলছে। ৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর আওতাভুক্ত হয়ে গেছে সক্রিয়ভাবে। মূলত

এই ট্রাস্ট এর পক্ষ হতে ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই পছন্দ করা হয় যে গুলো পিছিয়ে পড়া, যাদের সাহায্য দরকার বা বন্ধ প্রতিষ্ঠান-তাদের দায়িত্ব ট্রাস্ট নিয়েছে। প্রায় দুই কোটি টাকার একটি স্কলারশীপ ফাণ্ড জেনারেট করা সম্ভব হয়েছে। একটি যাকাত ফাণ্ডের মাধ্যমে অগণিত মানুষকে 'ইনকাম জেনারেটিং প্রজেক্ট' দেয়া হচ্ছে। এগুলো সবই শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর আশেক-ভক্তদের প্রদত্ত সহায়তার মাধ্যমেই করা হচ্ছে। ট্রাস্ট এটি পরিচালনা করছে। ওয়াজ, মাহফিল, সেমিনার, প্রকাশনা সহ বিভিন্ন তুরিকতের খেদমত আছে, এমন কি অনেক সময় অসুস্থ আলেমদের সহায়তা করা হচ্ছে। অমুসলিমদের জন্যও সহায়তা প্রকল্প আছে। আমাদের শ্লোগান হলো, 'মাইজভাণ্ডার জাতি ধর্ম বর্ণ সবার জন্য উন্মুক্ত'। কারণ রাসূল (দ.) এর দরবারও সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দরবারও সবার জন্য উন্মুক্ত। আমাদের এই নগন্য-অযোগ্য খেদমত, তুরিকতের মিশন হিসেবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছি। আপনাদের এখানে যদি কোন খেদমতে ট্রাস্ট আসতে পারে তবে ট্রাস্ট তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে। যে কোন ধরনের খেদমত (হতে পারে)। 'আন্তর্জাতিক সুফি কনফারেন্স'ও ট্রাস্ট আয়োজন করে থাকে। আপনারাও আরো অনেক স্কলার নিয়ে এখানে একটি কনফারেন্স আয়োজন করতে পারেন। আজকের মত আরো স্কলার একত্র করে একাডেমিক আলোচনা হতে পারে। আরো অনেক কিছু হয়ে যাবে। আরো অনেক সংগঠন রয়েছে, মাওলানা জালাল উদ্দীন আলকাদেরী সাহেব এখানে এই মাহফিলের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি এবং তাঁর জন্য রাফিয়াদ দারাজাত কামনা করছি। যাঁরা হয়ত আশুরা মাহফিল করছে। আপনারা শাহাদাতে কারবালা মাহফিল করছেন। তাঁদের সাথে যদি কোন মতপার্থক্য থাকে তবে তা কমিয়ে আনতে হবে। আমরা বাদ দিলে হবে না, যুক্ত করতে হবে।

আপনারা যে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার আলোচনা শুনলেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি কোন প্রখ্যাত বক্তা নই। আমি শুধু অনুভূতিগুলো প্রকাশ করলাম। আমার মাধ্যমে তুরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীয়াকে আপনারা যে সম্মান জানিয়েছেন তার জন্য আয়োজক, আলোচক সবাইকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাই। 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'।

বেলায়তে মোত্লাকা খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (ক.) প্রথম পরিচ্ছেদ সুনতে ওজমা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত মুসা (আ.) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নবীগণও এই পর্যায়ভুক্ত। এমনকি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর ধর্মকেও দ্বীন-ই-ইব্রাহীম বা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর ধর্ম বলা হয়। মহান আল্লাহুতায়াল্লা নিষিদ্ধ খাদ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েরদার তৃতীয় আয়াতে বলছেন, ‘আজই (এই) ধর্মকে তোমাদের জন্য পূর্ণতা দান করলাম। আমার নিয়ামত বা উপহারকে পূর্ণতা দিলাম এবং ইসলাম ধর্মে সম্বলিত হলাম। এরকম অবস্থায় পাপ কাজের প্রতি অনুরাগবিহীন যে কেউ ক্ষুধায় অস্থির (বেকারার) বা বাধ্য হয়, তার জন্য আল্লাহু দয়ার্দ ও ক্ষমাশীল।’^৬ এই আয়াতটিতে জ্ঞান, দর্শন এবং যুক্তিভিত্তিক মোহাম্মদীয়ুল মসরব ইসলাম ধর্ম (দ্বীন-ই-ইসলাম) পূর্ণতা লাভ করেছে বলে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এই আয়াতের আলোকে বুঝা যায়, ন্যায়নীতি, সাম্য এবং দয়া এই তিনটি গুণকে মূলতঃ ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য দান করেছে।^৭ যে জ্ঞান, দর্শন ও যুক্তি সম্বলিত নীতির উপর রিসালত ও শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো, ক. পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এরকম ইবাদত (ইবাদত-ই-মোতনাফিয়া) এবং খ. পরস্পর স্বার্থ সম্পর্কিত কার্যকলাপ (মায়ামেলাত -ই-ইয়েতেবারিয়া)। এটাই হচ্ছে রিসালত এবং শরিয়তের প্রধান স্তম্ভ। শরিয়ত হচ্ছে দৃশ্যমান বা নাসূত জগতের অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত, এই স্তরে যারা রয়েছে এ ধরনের মানুষের জন্য অবতীর্ণ। যাকে শইউনাতে তৌহিদী এবং মায়ামেলাতে অজুদী বলে। (যার অর্থ: মহান আল্লাহুতায়াল্লা ইচ্ছাশক্তি এবং মহান আল্লাহুতায়াল্লা সাথে সম্পর্ক সমূহ।) ইতোপূর্বে পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েরদার তৃতীয় যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তার শেষ ভাগে আছে, ‘যদি কেউ বেকারার বা অস্থির বা বাধ্য হয়, তার জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নয়।’ যাকে অবস্থাভেদে ব্যবস্থা নেয়ার পরিপোষক হিসেবে বোঝা যায়, এবং এটা মহান খোদার অনুগ্রহ ও ক্ষমার পর্যায়ভুক্ত।

নবুয়াতে ঈসায়ী:

সূক্ষ্মজগতের পর্যায়ভুক্ত আহমদীয়ুল মসরবের নবী ছিলেন

হযরত ঈসা (আ.)। হযরত মরিয়মের (আ.) সামনে সূক্ষ্মদেহী ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল (আ.) মানব আকৃতি নিয়ে দেখা দেয়া ঈসা (আ.) এর জন্মের কারণ, মহান আল্লাহুতায়াল্লা হুকুমে হযরত মরিয়মের (আ.) গর্ভে আসলেন নবী হযরত ঈসা (আ.)। নবী হিসেবে আদেশ নির্দেশ প্রদানের চেয়ে বরং ঈসা (আ.) এর কর্মপ্রক্রিয়ায় রহস্যময়তার প্রাধান্য অধিকতরো ছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের সাথে সার্বক্ষণিক মেলামেশার চেয়ে তিনি নিরিবিলি জীবনযাপন করতে ভালবাসতেন। প্রকাশ্য কার্যকলাপের চেয়ে অন্তরের ভালবাসাকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। একদিন হযরত ঈসা (আ.) উপাসনাকারী একদল লোককে প্রশ্ন করলেন, ‘তোমরা কারা?’। তাদের কাছ থেকে উত্তর পেলেন, ‘আমরা ইবাদত-বন্দেগীকারী, সংসার বিরাগী।’ তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘তোমরা কার ইবাদত-বন্দেগী কর?’ উত্তর পেলেন, ‘আমরা আল্লাহুতায়াল্লা নরকের আগুনকে ভয় করি (পাপীদের শাস্তির জন্য নরকাগ্নি), তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করি’। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং একদল রাহেব বা পাদ্রিকে (ধর্ম প্রচারকারী) দেখে প্রশ্ন করলেন, ‘তোমরা কার ইবাদত করছ?’ উত্তর পেলেন, ‘আমরা খোদাকে দেখার আশায় আছি। বেহেশত বা স্বর্গকে নিজ আবাসে পরিণত করার চেষ্টা করছি, যা তিনি তাঁর আউলিয়া বা সিদ্ধপুরুষ বন্ধুদের জন্য তৈরি করেছেন’। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, ‘খোদাতায়াল্লা উপর তোমাদের দাবি আছে, তোমরা যা চাইছ, মহান খোদা যেনো তা তোমাদের প্রদান করেন’ এরপর সামনে গিয়ে এরকম আরো একদল সংসার বিরাগী লোকের দেখা পেলেন তিনি। হযরত ঈসা (আ.) দেখতে পেলেন এসব লোকেরাও উপাসনা করছে। তিনি তাদেরকে আগের মতো করে প্রশ্ন করলেন, এবং উত্তর পেলেন, ‘আমরা খোদাতায়াল্লা প্রেমিক। কোনো ধরনের দোজখের (নরক) ভয় বা বেহেশতের (স্বর্গ) আশায় আমরা তাঁর ইবাদত করি না। আমরা শুধু তাঁকে ভালবাসি এবং তাঁর শানে জালালের (মহিমাময় মাহাত্ম্যের) কাছে মাথা নত করি’। তখন হযরত ঈসা (আ.) বললেন, ‘তোমরা খোদাতায়াল্লা প্রকৃত বন্ধু, তোমাদের সাথে থাকার জন্য আমাকে আদেশ করা

হয়েছে।^৮ হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর সংসার অনাসক্ত নির্বিলাসী খোদাতায়ালার প্রতি অনুরক্ত সহচরদের সঙ্গে ইসলামী সুফি সভ্যতার (জীবন ধারার) যথেষ্ট মিল দেখা যায়। এই আহমদীয়ুল মসরব ধারার নবীদের মধ্যে হযরত শীষ (আ.), হযরত ইদ্রীস (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.) প্রমুখ নবীগণকেও গণ্য করা যায়। এটা ইসমে বতুনে মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর গুণ্ড নাম আহমদের সাথে সম্পর্কযুক্ত; যা প্রথম স্তরে আহমদ নামে বিকশিত ছিল। মাওলানা আশরাফ আলী খানভী তাঁর 'নশরুত্তিব ফি জিকরিল হাবিব' গ্রন্থের ৩১৫/৩১৬ পৃষ্ঠাগুলোতে হাদিসে কুদসি'র মত অনুসারে উপরের বর্ণনা করে দেখিয়েছেন। সুফিদের পরিভাষায় এটাকে অজুদিয়া বা আত্মদর্শন ভিত্তিক পদ্ধতি বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় অজুদিয়া তুরিকত পছা আহমদীয়ুল মসরব ধারার নবুয়তের জ্বিল বা প্রতিচ্ছবি। যে ভাবে গাছ তার বীজে এবং বীজ গাছে তাদের গুণ-গরিমাসহ বিরাজমান থাকে।

'তাসাওউফে ইসলাম' গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় জনাব রঈস আহমদ জাফরী 'রুহানী জিন্দেগীর উৎকর্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন যে, যে অনুভূতি মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থাকে নিজের কাছে ব্যক্ত করে, তাকে রুহানী জিন্দেগী বা আধ্যাত্মিক জীবন বলা হয়। জোহ্দ ও তাসাওউফ হচ্ছে রুহানী জিন্দেগী বা আধ্যাত্মিক জীবনের আয়না (দর্পণ) বিশেষ। যেমন: ক. মোজাহেদায়ে নফস বা নিজ প্রবৃত্তির সাথে (বিরুদ্ধে) সংগ্রাম করা। খ. অনুভূতির আড়াল উন্মুক্ত করা। গ. কুলবের সাফাই বা অন্ত:করণের বিশুদ্ধতা (সাধন)। ঘ. শাহওয়াত ও হাওয়ায় অর্থাৎ, লালসা ও কামভাব থেকে নিজ নফস বা প্রবৃত্তিকে বিশুদ্ধ করা, এ রকম সংসার সম্পর্কীয় সম্পর্ক বর্জন করা (পরিহার করা) যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ভাঙ্গন আনে। এই রুহানী জিন্দেগী এমন এক জিন্দেগী, যার ধ্যান ধারণা মানুষকে দুনিয়া কি বস্ত্র এবং দুনিয়া সৃষ্টি করার কি উদ্দেশ্য তা চিনতে বাধ্য করে।

এই রুহানী জিন্দেগীর পূর্ণতা মানবীয় সত্তাকে স্রষ্টার অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিত করে দেয় এবং উর্ধ্বতম যে সত্য বস্ত্র আছে তার সাথে যোগাযোগ তৈরি করে দেয়। এটা নিজ সম্বন্ধে অনুভূতি জাগ্রতকারী; যে অনুভূতি সব ধরনের সন্দেহের অতীত বা উর্ধ্ব।

তৌহিদে আদ্বীয়ান বা সুফি মতবাদের সাথে জনাব গৌতম বুদ্ধের মতবাদ সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ (একমত) না হলেও বিরোধ সৃষ্টি করে না; এ বিষয়টি তাঁর উপদেশাবলী থেকে সম্পূর্ণভাবে (সম্যকরূপে) অবগত হওয়া যায়। জনাব গৌতম বুদ্ধের মতে

আত্মোৎকর্ষ সাধনই ধর্মের উদ্দেশ্য। এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে নিজের মধ্যে দয়াবৃত্তির পরিচর্যা ও চর্চা (পরিচালনা) করা প্রয়োজন। সুদৃষ্টি, সংসংকল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা আহরণ, সৎচেষ্টি, সৎস্মৃতি ও সম্যক সমাধি এই আট ধরনের উপায়ে মানুষ ধর্মমার্গে অগ্রসর হতে পারে। এটাই বৌদ্ধ ধর্মের অষ্টশীল নামে সুপরিচিত (খ্যাত)।

জনাব গৌতম বুদ্ধ খৃষ্টের জনের ৫৫৬ বছর আগে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্ত্র নামক জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন রাজা শুদ্ধধন, মাতার নাম মহামায়া। বালক বয়সে জনাব গৌতম বুদ্ধকে ডাকা হতো সিদ্ধার্থ নামে। শিক্ষাজীবনের শুরুতে তিনি আড়াল পণ্ডিতের কাছে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে রাজগৃহ গিয়ে এক গিরি গুহায় রুদ্রক নামের এক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি যান উরুবিল্ব নামের একটি গ্রামে। সেখান থেকে ভারতের গয়ার কাছাকাছি এক জায়গায় একটি বটবৃক্ষের নীচে ছয় বছর কঠোর সাধনায় সময় অতিবাহিত করেন। ভাগ্যবান সিদ্ধার্থ, সাধনায় সফলকাম হলেন (সিদ্ধ হলেন)। তাঁর চিন্তাধ্বংস দূর হয়ে গেলো। তিনি আত্মার (মানবাত্মার) স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হলেন। চিন্তাধ্বংসের সাথে কামনারও নির্বাণ হলো। কামনার সাথে ইন্দ্রিয়ের প্রভাবের নির্বাণ হলো। সুখের নির্বাণ হলো, দুঃখেরও নির্বাণ হলো। সব মানবীয় প্রবৃত্তিবোধ ও ইন্দ্রিয়জ প্রভাবকে জয় করে সিদ্ধার্থ নির্বাণ লাভ করলেন। সিদ্ধার্থ যথার্থভাবে সাধনায় সিদ্ধ হয়ে বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী হলেন। মাওলানা রুমি (রহ.) বলেন: 'স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়ার নামই দুনিয়া, সংসারসামগ্রী, টাকা-পয়সা ও স্ত্রী-পুত্র দুনিয়া নয়।'^৯

নবুয়তে মোহাম্মদী (দ.):

নবুয়তে মোহাম্মদী (দ.) হচ্ছে এমন একটি ধর্ম, যার শরিয়তী আদেশে (ধর্মীয় বিধি-বিধানে) রয়েছে কি করা যাবে এবং কি করা যাবে না। এই আদেশ অবস্থা অনুসারে কারণপ্রসূত। এই ধর্মে তুরিকতের রহস্যময় আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ ঘটায় এটি হয়ে উঠেছে আজমীয়তের বা মহানত্বের মর্যাদায় (শানে) প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত একটি ধর্ম। হযরত সোলায়মান (আ.) এবং হযরত ইউসুফ (আ.) এর ভাবধারায় (জাতে পাকে) এই ধর্ম প্রকাশিত এবং বিকশিত ছিলো। এই হিসেবে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (দ.) তাঁর মধ্যে মিলিতভাবে (একত্রিতভাবে) আহমদী ও মোহাম্মদী এই দুই ধারার নবুয়তীর সমাবেশ ঘটায় তিনি মাজমাউল বাহরাইন বা সন্ধিস্থল হিসেবে সাব্যস্ত হন। নবী করিম (দ.) এর বাণী 'লা

নাবীয়া বায়াদী' একটি পরম সত্য, এর অর্থ 'আমার পরে আর কোনো নবী নেই'। এই বাণীর মর্ম অনুসারে তিনি খাতামুন নাবিঈন।

'মাজমাউল বাহরাইন' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় জাহের বা প্রকাশ্য (নবুয়ত) এবং বাতেন বা গোপন (বেলায়ত) খোদায়ী বিকাশের এই দুই ধারার মিলনস্থল। এই সঙ্গমস্থলের মর্তবা হচ্ছে যে এটি খিজরী মাকাম। হযরত খিজির (আ.) হচ্ছেন এই দাওরায়ে নবুয়তের বা নবুয়ত যুগের 'কুতুবে মশিয়তে ইজদানি'। যার অর্থ তিনি ছিলেন খোদাতায়ালা হুজ্বাশক্তির মঙ্গলধারক। এটাই নবুয়ত জমানার (নবুয়ত চলাকালিন সময়ের) বেলায়তে ওজমার পূর্ণ বিকাশ। নবুয়ত ও বেলায়ত দু'টি বিষয় পৃথক হলেও বেলায়ত নবুয়তের স্তরে নবীর সত্তাতে মিলিত (একত্রিত) হয় এবং ভিন্নভাবে বিকশিত অবস্থাতে দৃশ্যতঃ নবীর শরিয়তী ছকুমের বাধ্য নাও থাকতে পারে। যেহেতু এঁরা (বেলায়ত লাভকারীগণ) খোদাতায়ালা হুজ্বাশক্তিকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন ও ধর্মীয় হেকমত (ধর্মীয় মহিমা) এবং মঙ্গল বুঝে কাজ করেন এবং কাজ করার অধিকারী হন, সেজন্য এবিষয়টি আল্লাহুতায়ালার কাছে প্রিয়। পবিত্র কোরআন মজিদে বর্ণিত হযরত মুসা (আ.) ও খিজির (আ.) এর কাহিনীটিই এর প্রমাণ। সামেরীর ঘটনাতে মসনবীর পরিভাষায় খোদাতায়ালা বাণীর মর্ম অনুসারে: হযরত মুসা (আ.)কে আল্লাহুতায়ালার তুর পর্বতে বলেছিলেন, 'তুমি মানবকে আমার সাথে মিলাতে এসেছো, না কি আমার কাছ থেকে দূরে সরতে এসেছো?'^{১০} অথচ সামেরীর জজবাতী বা ভাবপ্রবণ কথাবার্তা হযরত মুসা (আ.) এর জ্ঞান ও ধর্মমত অনুসারে আপত্তিকর ছিলো। পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত খিজির (আ.) এর ঘটনাবলী (কার্যাবলী) হযরত মুসা (আ.) এর শরিয়ত অনুসারে আপত্তিকর ও অবৈধ ছিলো। কিন্তু এখানে শরিয়তী ছকুম অপেক্ষা মহান আল্লাহুতায়ালার হেকমত ও রহস্যময় ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং তার দ্বারা হাকিকতে শরিয়তকেই (ধর্মীয় নির্দেশের সত্যকে) পালন করা হয়। যা গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর জীবন আদর্শেও দেখা যায়।

নবী করিম (দ.) এর বাণী: 'মহান আল্লাহুতায়ালার সাথে আমার এমন এক সম্পর্ক রয়েছে যেখানে আল্লাহুর নিকটতম ফেরেশতা নবীয়ে মোরসালদেরও বা কিতাবপ্রাপ্ত অন্য নবীদেরও স্থান হয় না।'^{১১} একথার অর্থ দাঁড়ায় এটা রসূল করিম (দ.) এর বেলায়তে ওজমার বিশেষ স্তর। এই স্তরে ফেরেশতা

বা বিশেষ নবুয়তীশুণের নবীদেরও পৌছার সক্ষমতা নেই। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে পবিত্র মেরাজ শরিফ, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহুর সাথে নবী করিম (দ.) এর সাক্ষাৎ ঘটেছিলো। এই ঘটনা অন্য নবীদের বেলায় ঘটে নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নবুয়তে ওজমা ও বেলায়তে ওজমা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (দ.) এর জীবন ও ব্যক্তিত্বে বিকশিত ছিল। যাকে বেলায়ত বলা হয়, তা একটি চিরকালিন সত্য, যা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (দ.) এর এই পার্থিব জগৎ ত্যাগের পর অলীয়ে কামেলদের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত থাকে। সেই সাথে সব ধরনের বেলায়ত, বিশেষ করে বেলায়ত বিল অরাসত ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী (রা.) এর জীবন ও ব্যক্তিত্বে কেন্দ্রীভূত হয়। হুজুরে আকরাম (দ.) বলেছেন: 'আমি যার মাওলা (প্রেমাস্পদ হই) আলী (রা.) তার মাওলা, আমি এরকম (দু'টি মহান) বস্তু তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি যা তোমরা আঁকড়ে ধরলে আমার (তিরোধানের) পর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। (প্রথম) তোমাদের হাতে কিতাবুল্লাহ বা কোরআনপাক এবং (দ্বিতীয়) আমার আহলে বাইত।' [রাসূলে করিম (দ.), হযরত আলী (রা.), হযরত মাফতিমা (রা.), হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোসাইন (রা.) এবং তাঁদের বংশধরগণ। (তিরমিজি, মিশকাত)]^{১২}

ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী (রা.) রসূলুল্লাহ (দ.) এর জন্য নিজের দেহ ও প্রাণ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে ভালবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হযরতের সময় রসূলুল্লাহ (দ.) এর বিছানায় মহানবীর চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়েছিলেন রসূলুল্লাহ (দ.) জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে। হযরত রসূলুল্লাহ (দ.) এর আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি যা নবুয়তে সুপ্ত ছিলো, তা হযরত আলী (রা.) এর জাতে পাকে (পবিত্র সত্তায়) প্রস্ফুটিত হলো। ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী (রা.) এর বাণীতেও এবিষয়টি প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, 'আমি মহাপ্রতাপশালীর নিয়ন্ত্রণে রাজি হয়েছি, আমার ভাগে ইলম বা জ্ঞান এবং আমার বিপক্ষের ভাগে ধন ঐশ্বর্য পড়েছে।'^{১৩} হযরত আলী (রা.) এর মধ্যে রসূলে করিম (দ.) এর অনন্ত গৌরবময় বেলায়তী অভিযানের দরজা উন্মুক্ত হলো।

পবিত্র হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে: 'আমি ইলমের শহর বা হেকমতের ঘর এবং আলী এর দরজা।'^{১৪} এই বেলায়তে ওজমা প্রকৃতিগত ধারায় প্রবাহিত হয়ে তার মহিমাশিত কেন্দ্র হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (ক.) এর ব্যক্তিত্ব ও জীবনে স্থান লাভ করে। তাঁর পবিত্র বাণী: 'আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের ফলে কুতুব হলাম।' এই

বাণীই তাঁর মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। গাউসিয়ত তাঁর সময় থেকেই, নবুয়ত ও বেলায়তের যুগল প্রতিনিধিত্ব শুরু করে। এই গাউসিয়ত ও কুতুবিয়ত হুজুরে করিম (দ.) এর নবুয়ত ও বেলায়তের যুগে তাঁর সঙ্গেই ছিলো, এবং তাঁর ভিতরেই কার্যকর শক্তিরূপে বিরাজমান ছিলো। বেলায়তের এই রুহানি শক্তি (আধ্যাত্মিক শক্তি) নবুয়ত থেকে স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেছে। যেমন: পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হযরত সোলায়মান (আ.) এর সময়ে রাণী বিলকিস-কে তার সিংহাসনসহ নিয়ে আসা।^{১৫} পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহাফের ঘটনা এবং হযরত মুসা (আ.) ও খিজির (আ.) এর সাক্ষাতের ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে। দীর্ঘ সময়ের আবর্তন ও বিবর্তনের কারণে মানুষ স্বাভাবিক ও গতানুগতিক ধারায় দ্বীন-ধর্ম, হাল, জজ্বা, মাহুবিয়ত, ইসতিগরাক বা খোদায়ী ভাব বিভোরতা থেকে দূরে সরে পড়ছিলো। যারা দ্বীন-ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলো তারাও নানারকম মতদ্বৈততা (ইখতেলাফ) প্রসূত মাজহাব নিয়ে বিবাদ এবং বাহ্যিক প্রচারণার কারণে বেলায়তে ওজমার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গিয়েছিলো। এরকম পরিস্থিতি একজন রুহানি শক্তিসম্পন্ন (আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান) মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো। হিযরি পঞ্চম শতাব্দীতে মানুষের মনে তাজা প্রেরণা সৃষ্টি ও সংস্কার কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে আউলিয়াদের সর্দার কুতুবুল আকতাব হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (ক.) এর আবির্ভাব ঘটে (৪৭১-৫৬১ হিযরি)।

পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহুতায়লা বলেন: ‘আল্লাহকে স্মরণকালে ঈমানদারদের হৃদয় নম্র হওয়া এবং অবতীর্ণ সত্যবাণীর কাছে বিনয়ী হওয়ার সময় কী নিকটতম নয়? যারা ইতোপূর্বে ঐশিগ্রহ পাওয়ার পর তাদের সময় সুদূর অতীত হয়েছে, তাদের হৃদয়ের মধ্যে মলিনতা ও কঠোরতা এসেছে এবং তাদের বহু লোক ফাসেক হয়ে গেছে বা ভেঙ্গে পড়েছে, তাদের মতো না হওয়া কী দরকার নয়?’^{১৬} কোরআনপাকে আল্লাহ বলেন: ‘জেনে রাখ আল্লাহ, মরে যাওয়া ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তোমাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য এটি একটি নিদর্শনমূলক বর্ণনা।’^{১৭}

সময়ের পরিক্রমায় মহাকালের আবর্তন-বিবর্তনে জাতির উত্থানপতন এবং ঘূর্ণায়মান গ্রহ-নক্ষত্ররাজির প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হওয়ার কারণে সৃষ্টির ভাঙ্গাগড়ার জন্য পাঁচ-ছয় শতাব্দীর একটি দায়রা বা মহাকাল বৃত্তের কথা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন। ‘ইতিহাসবেত্তাদের পিতা’ হিসেবে আখ্যাপ্রাপ্ত

ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মোকদ্দমা’য় এবং মহামনীষী হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (ক.) তাঁর ‘ফুসুসুল হিকম’ গ্রন্থে এই মহাকাল বৃত্তের কথা প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহুপাক বলেন: ‘আসমান জমিনের সৃষ্টি ও দিনরাত্রির আবর্তন-বিবর্তনে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বহু নিদর্শন বিরাজমান রয়েছে।’^{১৮}

দেখা যায় হযরত ঈসা (আ.) এর আবির্ভাবের প্রায় ছয়শ বছরের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর আবির্ভাব ঘটে। মহানবী (দ.) এর আবির্ভাবের পাঁচশ বছরের মধ্যে হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর (ক.) এর আবির্ভাব ঘটে। এই দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে বলা যায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মহান আল্লাহর ইচ্ছাশক্তি বেলায়তকেও ইরশাদী রিসালত বা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সত্য প্রকাশ করতে বাধ্য করে।

হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর (ক.) তাঁর ‘ক্বাসিদায়ে গাউসিয়া’য় বলেছেন: ‘সমস্ত অলী-আল্লাহ আমার পদাঙ্ক অনুসারী। আমি, পূর্ণচাঁদ হযরত মোহাম্মদ (দ.) এর পদাঙ্ক অনুসারী। অলীদের মধ্যে আমার সমকক্ষ কেউ নেই, এলেম এবং প্রভাব বিস্তারের বেলায়ও আমি অদ্বিতীয়। আমি জিলান নগরের অধিবাসী। আমার উপাধি হচ্ছে মুহিউদ্দীন বা ধর্মের পুনর্জীবনদাতা। আমার প্রতীক বা পতাকা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত।’^{১৯} এই দাবীই প্রমাণ করে হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (ক.) মহান আল্লাহর কাছ থেকে ইলহামপ্রাপ্ত বেলায়তে ওজমার সম্মানের অধিকারী মোজাদ্দিদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অলি-আল্লাহ। তিনি ধর্মের সত্যকে পৃথিবীর সত্যবিমুখ অজ্ঞ পর্যায়ের মানুষের মধ্যে উপদেশ, শিক্ষা ও চর্চার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। সুফি পরিভাষায় এধরনের মহিমাময় ব্যক্তিত্বকে গাউসুল আযম বলা হয়। প্রথম গাউসুল আযম হিসেবে তিনি ইসলামী জগতে স্বীকৃতি লাভ করেন। যেহেতু স্বর্গীয় (আলমে লাহুত) এবং পৃথিবীর (আলমে নাসুত) এর মধ্যে আল্লাহুতায়লার সকল সৃষ্টি জগতের খবর সম্পর্কে তিনি অবগত এবং ত্রাণকর্তা গাউসুল আযমে এশেতাহিয়া বা আরম্ভকারীর আসনে প্রতিষ্ঠিত সেহেতু তাঁকে চেনা এবং বুঝা সবার জন্যই প্রয়োজন। এর মধ্য দিয়ে সবারই উপকৃত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাই নবুয়তের মতো এই গাউসুল আযমিয়তের দাবিরও প্রয়োজন আছে এবং তাঁর সংখ্যাভীত কিরামত প্রকাশেরও প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে সাধারণ মানুষ তাঁকে চিনতে বা বুঝতে সক্ষম হবে না, ফলে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে হতে পারবে না। এ অবস্থায় বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগে হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর

(ক.) এবং বেলায়তে মোতলাকা যুগে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহকেই (ক.) দাবিদার হিসেবে দেখা যায়। অন্য কোনো বুজুর্গকে এরকম সর্বাঙ্গীন রুহানী ইলমের (আধ্যাত্মিক জ্ঞানের) বা গাউসে আযমিয়তের দাবি করতে দেখা যায় নি এবং এরকম সর্বস্তরের অসংখ্য কিরামতও তাঁদের থেকে প্রকাশ পায় নি। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ২৩, ২৪ নং আয়াতের মতো এই স্তর সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, অন্য দাবিদার যদি থাকে সামনে আনো, অথচ পারবে না। যদি এই দাবিযুক্ত বুজুর্গবাণী দেখাতে না পারো, তবে খোদাতায়ালাকে ভয় করো। বুজুর্গের জীবন-ব্যক্তিত্বের নামে মনগড়া প্রচার বন্ধ কর, কারণ এটা পাপ। ‘যা তোমরা জানো না, তা বলা আল্লাহুতায়ালার কাছে নিশ্চয়ই মহাপাপ।’ এই খোদায়ী বাণী ধ্যানের মাধ্যমে অনুধাবন কর।^{২০} যে কোনো অনুমান পাপ, এটাকে পবিত্র হাদিসের সতর্কতার মতো মনে করো। এই পরিচ্ছেদের সর্বশেষে হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এর বাণী:^{২১} ‘তোমরা যাতে নিম্নবর্ণিত চারটি অবস্থার কারণে ধর্মহীন হয়ে না যাও।

ক. যখন মানুষেরা যা জানে তা করে না;

খ. যা করে তা জেনেশুনেই করে;

গ. যখন মানুষেরা নিজেরা যা জানতে চায় অন্য মানুষদেরকে তা জানতে দেয় না;

ঘ. যখন মানুষেরা যা জানে না তা জানার জন্য চেষ্টাও করে না”।

সারানুবাদ: ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক খাদেমুল ফোকারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (ক.) পবিত্র কোরআন, হাদিসে কুদসি এবং যে সব মূল্যবান গ্রন্থের উদ্ধৃতি, যুক্তি ও প্রমাণ ব্যবহার করেছেন তার তথ্যসূত্র সাথে সাথেই উল্লেখ করে আধুনিক গবেষণার অভিসন্দর্ভের মতো ঐ পৃষ্ঠার নীচেই তা যুক্ত করেছেন। এই সারানুবাদে পরিচ্ছেদের শেষে একত্রে সেগুলো ক্রমানুসারে সন্নিবেশিত হলো।

মূল গ্রন্থের তথ্যসূত্র (Sources):

১. ক. পবিত্র কোরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত: ৬০-৮২।
খ. ক্বাসিদায়ে গাউসে সাকলায়েন, হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)।
২. আয়নায়ে বারি, মাওলানা সৈয়দ আবদুল গনি কাঞ্চনপুরী (রহ.)।
৩. মতালেবে রশীদী, মাওলানা তোরাব আলী কলন্দর, ভাষা:

ফার্সি, প্রকাশক: নওল কিশোর।

৪. নশরুত্তিব ফি জিকরিল হাবিব, মাওলানা আশরাফ আলী খানভী, প্রকাশস্থল: কানপুর, পৃ. ৩১৫-৩১৬।
৫. হযরত মাওলানা রুমী (রহ.) এর মসনবি শরিফের সংকলন, দিওয়ানে নূর, ভাষা: বাংলা, পৃ. ৬৭।
৬. আল কোরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩।
৭. মজমুয়া ফতোয়া, মাওলানা আবদুল হাই, পৃ. ৩০।
৮. তাসাওউফে ইসলাম, ড. মোহাম্মদ মোস্তফা হেলমী, প্রফেসর ফোয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় মিশর, অনুবাদ: রইস আহমদ জাফরী, ভাষা: উর্দু, প্রকাশক: গোলাম আলী এণ্ড সন্স, পৃ. ৯২, ৯৩, ৯৪।
৯. মসনবি, মাওলানা রুমি (রহ.)।
১০. মসনবি, মাওলানা রুমি (রহ.)।
১১. হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর বাণী, হাদিস শরিফ।
১২. হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর বাণী, হাদিস শরিফ, তিরমিজি শরিফ ও মিশকাত শরিফ।
১৩. ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী (রা.) এর বাণী।
১৪. হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর বাণী, হাদিস শরিফ।
১৫. বরখিয়ার পুত্র আছব, হযরত সোলায়মান (আ.) পরিষদ সদস্য।
১৬. পবিত্র কোরআন, সূরা হাদিদ, আয়াত: ১৬।
১৭. পবিত্র কোরআন, সূরা হাদিদ, আয়াত: ১৭।
১৮. পবিত্র কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৬৪।
১৯. ক্বাসিদায়ে গাউসিয়া, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.)।
২০. আল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৩, ২৪। এই আয়াতের পর কোন ধরনের প্রমাণহীন ভিত্তিহীন বক্তব্য দেওয়া গুনাহ বা পাপ, এটা পবিত্র হাদিসেরই ঘোষণা ধরে নাও’ শীর্ষক বক্তব্যটি সম্মানিত লেখক তুলে ধরেছেন মাওলানা সানাউল্লাহ নদভীর ‘ফতহুর রব্বানী’ গ্রন্থ থেকে। গ্রন্থটি অনূদিত বলে তথ্য যুক্ত রয়েছে। মূল গ্রন্থটির ভাষা ছিলো উর্দু। সেটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিলো লাহোরের (পাকিস্তান) আলমী প্রিন্টিং প্রেস থেকে।
২১. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এর বাণী। চার রকম পরিস্থিতিতে কেউ যেনো ধর্মত্যাগী না হয়। সুনির্দিষ্ট চারটি পরিস্থিতির উদ্ধৃতি। এ প্রসঙ্গে সম্মানিত লেখকের মূল ভাষ্যও পীরানে পীর (ক.) এর বাণীর সম্পূরক, যেমন: ‘অর্থাৎ এই চতুর্বিধ অবস্থার ফলে ধর্মহারা না হও’।

সারানুবাদের সহায়কসূত্র: ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী অনূদিত ‘BELAYET-E-MUTLAKA’ (The Unchained Devine Relations or Unhindered Spiritual Love of God) ইংরেজী দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৭।

সংশোধনী

মাসিক আলোকধারা সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত বেলায়তে মোতলাকার সারানুবাদের প্রথম পরিচ্ছেদের ‘বেলায়তের স্তরভাগ বা বিভিন্ন সীমানা’ অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটিতে ‘কেয়ামত’ শব্দটির স্থলে ‘কিরামত’ পাঠ করতে হবে।- সম্পাদক

বেলায়তে মোত্লাকার অনন্ত পথের দিশারী হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) : নীরবতাই যার ঐশী অলংকার

● আলোকধারা ডেস্ক ●

॥ ১ ॥

গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর আধ্যাত্মিক শরাফতের সফল উত্তরাধিকারী গুলেবাগ গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর অনুপম চারিত্রিক ও দৈহিক সৌন্দর্য এবং বিশিষ্টতার কারণে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার অনুসারীদের অশেষ ভক্তি শ্রদ্ধায় দীপ্তিমান হয়ে আছেন। আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে তাঁর ইশকের জালোয়া এখনো আশেক-ভক্ত কুলকে স্রষ্টাপ্রেমের প্রত্যাশায় দিওয়ানা করে তুলছে। শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য এবং উজান যৌবনের অভিলাষ, উচ্ছ্বাসমুখর কর্মপ্রেরণাদীপ্ত সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন পরম আরাধ্য হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলার একান্ত সান্নিধ্যে। নবজাতকের অবস্থান থেকে চল্লিশ বৎসর বয়সে মানব মনহরা যুবক হয়েও তাঁর প্রতিটি আধ্যাত্মিক অবস্থানের দ্রুত বিকাশ ঘটেছে হযরত কেবলা কাবার সরাসরি তত্ত্বাবধান এবং অনুপম দিক নির্দেশনায়। সাধনা স্তরে মুর্শিদ মওলার মাধ্যমে এ ধরনের একান্ত পরিচর্যা আর কারো ভাগ্যে জুটেছে কিনা সন্দেহ। পিতৃব্য হযরত কেবলা কাবার অহর্নিশ দর্শন লাভে অনন্তকৃপা অর্জন করেছেন ড্রাতুস্পুত্র গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.)। মকতব, মসজিদ, মাদ্রাসা, মোরাকাবা, মোশাহাদা, সালাতুত দায়েম, সিয়ামুদ্দহর সবকিছুতেই পিতৃব্য হযরত গাউসে পাকের (ক.) পবিত্র নজরে করমের বরকতে আধ্যাত্মিক সাধনায় পরম সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন। প্রেমতাড়নায় ভোগবিলাস এবং বৈষয়িকতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে পাহাড়, জঙ্গল, গিরি উপত্যকার স্থাপদ সংকুল পরিবেশে বে-রিয়া বেশে আশ্রয়হীন পথিকের মতো অহোরাত্রি ঘুরে ঘুরে সাধনায় মগ্ন থেকেছেন তিনি। খাওয়া দাওয়া নেই, বস্ত্র-বসন, দৈহিক সুস্থতা ও সৌন্দর্য রক্ষার প্রতি বিন্দু পরিমাণ আকর্ষণ নেই- সব কিছুর উর্ধ্বে তিনি কামনা করেছিলেন গাউসে পাক হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহর (ক.) একান্ত অপরূপ অন্তর্দর্শন। হযরত কেবলার অন্তর্দর্শনের অশেষ কৃপা হাসিল করে আশেকের পরিপূর্ণ স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে সমস্ত ভয়, শংকা,

সংকোচ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব অতিক্রম করে বিজলীর চাইতেও গতিময় প্রেরণায় এগিয়ে যান তিনি। আল্লামা রুমীর ভাষায় এ পথে “জাহেদগণ ভয়ে ভয়ে পায়ে হেঁটে চলে, আশেকগণ বিজলী ও হাওয়ার চাইতে বেশি গতিতে এগিয়ে চলে।” পরবর্তী সময়ে লক্ষ্য করা যায়, বাবাজান কেবলাকাবা অভিধা পেয়ে তিনি মূলতঃ মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকায় এ ধারার পথ প্রদর্শকের সুমহান গৌরব অর্জন করেছেন।

॥ ২ ॥

বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) মুর্শিদ মওলা হযরত কেবলার (ক.) পবিত্র জবান থেকে আগন্তুক-দর্শনার্থীদের প্রতি প্রায়শঃ নিসৃত হত রূপক কালাম (কথাবার্তা)। হযরত কেবলা আলমের এ সকল কালাম এতোই অর্থবোধক ছিল যে, প্রতিটি কথাই অসংখ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যেত। আর এ ধরনের বাক্য যার প্রতি নিষ্ফিণ্ড হতো, শুধু তিনিই সহজে বুঝে নিতে পারতেন। অন্যদিকে গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবার নিকট থেকে দর্শন প্রত্যাশী-আগন্তুকদের দর্শনীয় ছিল রূপক আচরণ। বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) রূপক আচরণে প্রেম উতালায় বেসামাল হয়ে পড়তেন আশেক, ভক্ত, জায়েরীন, তামাশগীর ও তালেবীনরা। তাঁর সম্পর্কে তাই গীত হয়েছে, “বাবা মুখে কথা নাহি বলে; টেলি চালায় দিলে দিলে।” অর্থাৎ বাবা ভাণ্ডারী (ক.) কালাম পরিবেশন করে নয় আচরণের রূপকতায় জনমানুষ এবং আগন্তুকের অন্তরে মরমীয়া প্রেরণ করে মাণ্ডকের প্রতি অত্যাশ্রহ সৃষ্টি করেছেন। বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) আল্লাহ-দর্শন হচ্ছে মূলতঃ প্রেম দর্শন। ইশকের দামান নিয়ে মদহুশে মস্ত মস্ত হয়ে প্রেমাস্পদে নিঃশেষ হতে পারলেই প্রেমাস্পদ (মাণ্ডক) আশেকের একান্ত আপনার হয়ে যান। তখন আশেক-মাণ্ডকের ভেদরেখা বিলীন হয়ে যায়। আশেক মাণ্ডকে রূপান্তরিত হন এবং মাণ্ডক আশেকেই উদ্ভাসিত হন। বাবা ভাণ্ডারী (ক.) হলেন মাইজভাণ্ডারীয়া-তুরিকায় বেলায়তে মোত্লাকার এই অনন্ত পথের দিশারী। বাবা ভাণ্ডারী (ক.) তাঁর আযমতের শ্রেষ্ঠতম অবস্থানে পৌঁছে সার্বক্ষণিকভাবে নীরবই থেকেছেন। নীরবতাই হয়ে ওঠে তার ঐশী অলংকার। আল্লামা রুমী মসনবী শরীফে এ ধরনের অবস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, “নীরবতাই

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম।” “প্রেমের চূড়ান্ত রহস্যকে উপলব্ধি করতে হলে নীরবতাকে উপলব্ধি করতে হবে।” এ অর্থে-বাবা ভাণ্ডারী (ক.) হলেন মূলতঃ ইশ্ক বা প্রেম। তাই বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) সান্নিধ্যে উপনীত হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় কুলকিনারাহীন প্রেমের অনন্ত দরিয়ায় বাঁপিয়ে পড়া। এখানেই আশেক ভক্তের রব ওঠে; “পার কর ডুবাইয়া মার মহিমা তোমার।”

১৩১

সুলতানুল আরেফিন হযরত শাহসুফি বায়েজীদ বোস্তামী (ক.) উল্লেখ করেছেন, ঐশী প্রেমের চোখ বলসানো জলসায়, “আমি নীরবতার চেয়ে উজ্জ্বলতম কোন প্রদীপ জ্বলতে দেখিনি।” অর্থাৎ বাবা ভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবার নীরবতা হচ্ছে মহান স্রষ্টার প্রেমাস্পদ অভিসারের নীরবতা। এ নীরবতা অতীব তাৎপর্যবোধক। বাবা ভাণ্ডারী (ক.) নীরব থেকেছেন অথচ সকল আগন্তকের মনে হৈ-চৈ সৃষ্টি করে কল্লোল কলরবে সমগ্র পরিবেশকে ঐশী ধারায় মাতোয়ারা করে তুলেছেন। আশেক ভক্তকুল প্রেমনেশায় উন্মত্ত হয়ে বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) প্রচণ্ড নীরবতার মধ্যে হঠাৎ একটি আহা-হু শব্দ প্রত্যাশা করেছেন। এ অবস্থায় বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) অবস্থান দাঁড়ায় আল্লামা রুমীর ভাষায়; “তিনি সবকিছু জানেন এবং স্বীয় বাহন চূপ চাপ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তোমাদের সম্মুখে শুধু গোপন করণার্থে মিষ্টি ও মুচকি হাসছেন।” বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) ইহজাগতিক সময়ে তাঁর হুজরা শরীফে সমবেতজন বাবা ভাণ্ডারী (ক.) কে স্বীয় আসন শরীফে শায়িত অবস্থায় এভাবেই দর্শন করেছেন।

১৪১

বাবা ভাণ্ডারী (ক.) নীরব-নিশ্চুপ থেকে সাধক সমাজকে বিমুগ্ধ করেছেন। বিমোহিত সাধকদের মধ্যে তাঁর নীরবতা সতত কৌতূহল সৃষ্টি করত। আগন্তক ও দর্শনার্থীর ফরিয়াদের জবাবেও তিনি নীরব থেকেছেন। কিন্তু তাঁর পবিত্র চোখ এবং চেহারার রং বেরং এর উপর ফরিয়াদীর জবাব মিলত। অপলক নেত্রে কখনো কখনো দর্শন প্রত্যাশীর দিকে তাকালেও মুখে কথা না বলায় প্রায় প্রত্যেকের নিকট তাঁর আচরণের রহস্যময়তার প্রকাশ ঘটত। স্রষ্টার রঙে রঞ্জিত বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) প্রচণ্ড নীরবতা সম্পর্কে চিত্ত ব্যাকুল আশেক ভক্তদের প্রতি গরীবে নেওয়াজ সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তি আজমিরী সনজেরীর (ক.) ভাষায় বলা যায়; “হে মঈন, সে তোমার মাঝেই ডুবে আছে, তবু তার নাম কেন জিজ্ঞাসা করো, নীরবতা ছাড়া এখন তার অন্যকোন জবাব নেই।” অর্থাৎ বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) আযমত জিজ্ঞাসা করলে জবাবে প্রচণ্ড নীরবতা ব্যতীত অন্যকোন শব্দের প্রত্যাশা করা শোভন

বহির্ভূত। কারণ, তিনি যেখানে অন্তহীন অবস্থায় অন্তর্লীন হয়ে আছেন, সেখান থেকে জবাব প্রদানের সময়সুযোগ এবং অবকাশ নেই। তিনি কে, কি তাঁর পরিচয়-একমাত্র নীরবতার মধ্যেই এর জবাব নিহিত আছে।

১৫১

বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) অভেদ রহস্যের মধ্যেই হর-হামেশা মগজুদ ও বিভোর থেকেছেন। পৃথিবীর মানুষের পক্ষে সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির মাধ্যমে তা জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। হযরত খিজির (আ.)-এর রহস্যময় আচরণ সম্পর্কে হযরত মুসা কলিমুল্লাহ (আ.) কে কোন প্রকার প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে আল্লাহুপাক নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনন্ত রহস্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্যে মানুষের সীমাহীন আগ্রহ থাকা বাঞ্ছিত। আল্লাহর রহস্য বা আসরারে খুদী যদি অপাত্রে এবং সাধারণ্যে ভেদ করা হয়, তাহলে এর প্রতি আগ্রহ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। মহামূল্যবান রহস্য বিষয় অমূল্যে জ্ঞাত করা বাঞ্ছিত নয়। আল্লাহর সীমাহীন রহস্যের অনেক কিছুই প্রকাশ পেলেও মূল রহস্যবিন্দু প্রকাশের অন্তরালেই থেকে যায়। কারণ আল্লাহুপাক ইরশাদ করেছেন; “আমি মানুষের রহস্য; মানুষ আমার রহস্য।” এ রহস্যের মূল ঠিকানায় আল্লাহুপাক যাকে মেহেরবাণী করে পৌঁছিয়েছেন, তিনি অফুরন্ত রহস্য ভাণ্ডার হয়েই বিরাজ করছেন। দিওয়ানে মঈনুদ্দিনে এ ধরনের অবস্থানের বর্ণনা এসেছে এভাবে, “সৃষ্টি আমাকে বলেছে, হে মঈন, মিস্বারে ওঠে এ রহস্যের কথা বলোনা-এ আগুনের আহু ধ্বনিতে হাজার বক্তা ও মিস্বার জ্বলে গেছে।” জনসমাজে রহস্য ভেদ করলে হাসি-কান্না-আনন্দ বেদনার মোহনীয় এ পৃথিবীতে মানুষ সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বিষাদগ্রস্ত জীবনের প্রতি ঝুঁকে পড়বে। এতে স্রষ্টার পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই আর থাকবে না। বাবা ভাণ্ডারী (ক.) নীরবতা অবলম্বন করে স্রষ্টা-ধর্মই পালন করে গেছেন।

১৬১

স্রষ্টা পৃথিবীতে প্রকাশমান হলেও স্রষ্টার অন্তর্নিহিত রহস্য প্রকাশে কঠিন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহু তাঁর সর্বব্যাপী অবস্থান সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহর সাথে রহস্যময় প্রেম নিবেদনের পূর্ব প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, তাঁর রহস্য মুখে প্রকাশ না করা। অন্তর্জগতে সবকিছু দৃশ্যমান হলেও এ অসীমত্বের নিত্য নতুন সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু না বলার বিধি নিষেধ আরোপিত থাকার কথা বার বার উল্লেখ রয়েছে ধর্মীয় বিধান এবং আউলিয়া দরবেশদের বক্তব্যে। খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তির (ক.) মতে,

“হে মঈন, তুমি যদি তাঁর রহস্য মুখে প্রকাশ করতে চাও, সে রহস্যের মোকাম হচ্ছে ফাঁসিকাষ্ট, মিস্তার তা ধারণ করে না।” অর্থাৎ রহস্য ভেদ করে মসজিদের মিস্তারে দাঁড়িয়ে কথা বলার অধিকারে ঐশী শৃঙ্খলার পক্ষ থেকে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহর সাথে তাঁর প্রিয়তম বান্দার অব্যক্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা পেলে এবং তা সাধারণ্যে প্রকাশ করলে বিনিময় হচ্ছে নিজেকে কোরবানী প্রদান। অতএব ঐশী সম্পর্কের রহস্যঘেরা গোপনীয়তা স্বীয় জবানে প্রকাশ করলে ইহজাগতিক হায়াতের ছন্দপতন ঘটবে। এতে মানুষ হেদায়েতের আলো থেকে বঞ্চিত হবে। তাই পৃথিবীর মানুষের কল্যাণ স্বার্থে প্রচণ্ড নীরবতাই ছিল বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) একমাত্র অবলম্বন।

১৭১

শরাবে ইশ্ক পানের মাধ্যমে আশেকের মধ্যে খোদাপ্রেমের যে বেহাল দশার সৃষ্টি হয়, তাতে সকলের পক্ষে সংঘম প্রদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে ওঠে না। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলায়ে আলম (ক.)-এর অনেক আশেক ইশ্কের শরাব পান করা মাত্রই উতল-মাতাল হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি (হযরত কেবলা) কাউকে কাউকে চাঁদের পুকুরে অথবা হযরতের পুকুরে ডুবে থাকতে নির্দেশ

দিতেন। পর্যায়ক্রমে শান্তভাবে ধারণ করলে মাইজভাণ্ডারী দরবার শরীফ থেকে অন্যত্র চলে যেতে হুকুম দিতেন। অর্থাৎ প্রেমের শরাব নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে স্থানীয় পাত্র প্রয়োজন। পাত্রের অনুপাতে ইশ্কের শরাব পান করলে এবং এ ব্যাপারে কৌশল রপ্ত থাকলে প্রেমজগতে অহরহ উরুজ পরিদৃষ্ট হয়। প্রেম শরাব পান করার পর একটুতেই বেসামাল হলে প্রেমজগতের প্রাথমিক অবস্থায় চরম অস্থিরতা প্রাধান্যে চলে আসে। এতে অনেক সময় সাধকের কক্ষচ্যুতি ঘটান সম্ভাবনা থাকে। জজবা হালের অত্যাধিক্যের কারণে অনেকের পক্ষে সুনির্দিষ্ট মোকামে পৌঁছে তাতে সুস্থির অবস্থান গ্রহণ সম্ভব হয়ে ওঠেনা। কিন্তু বাবা ভাণ্ডারী (ক.) শত সহস্র পেয়ালা প্রেম-সুধা পান করা সত্ত্বেও ছিলেন নীরব, শান্ত, ধীর এবং স্থিত স্থির। খাজা গরীবে নেওয়াজের ভাষায় বললাম, “মঈন যদি এ শরাবের শত পেয়ালাও পান করে, সে পাহাড়ের মতো নিস্তরূ হয়ে থাকবে।” মূলতঃ অধ্যাত্মজগতে সীমাহীন বিপ্লব ঘটানোর পরেও বাবা ভাণ্ডারী (ক.) সুউচ্চ পাহাড়ের মতো নিস্তরূই থেকেছেন ২৯ আশ্বিন বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) পবিত্র খোশরোজ দিবসে তাঁর অসীম দয়াই আমাদের প্রত্যাশা।

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান ‘শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল’ কর্তৃক ২০১৯ পর্বের মেধাবৃত্তি’র আবেদন ফরম বিতরণ

‘শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট’ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান ‘শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল’ এ পর্যন্ত ৮১৫ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে ২৭ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। ভবিষ্যতে এর ব্যাপ্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৯-০৯-২০১৯ তারিখ রবিবার বৃত্তি তহবিল পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু আহমদ এর সঞ্চালনায় ২য় সভা সভাপতি লায়ন এম. নাছির উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ২০১৯ পর্বের মেধাবৃত্তির জন্য মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদের নিয়ন্ত্রিত থানা ও শাখা কমিটি সমূহকে ৪টি জোনে ভাগ করা হবে। যথাক্রমে- ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম মহানগর। ঢাকা ও কুমিল্লা জোনকে ১১ অক্টোবর ২০১৯ মহান ২৬ আশ্বিনের দিন সমন্বয়কারীদের সাথে মিটিং করে আবেদন ফরম দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। চট্টগ্রাম (৪টি থানা-ফটিকছড়ি, রাউজান, বোয়ালখালী ও চন্দনাইশ) ও চট্টগ্রাম মহানগর জোনকে ২৬ আশ্বিনের পর সুবিধামত সময়ে সমন্বয়কারীদের সাথে মিটিং করে আবেদন ফরম দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তাছাড়া চসিক নিয়ন্ত্রণাধীন ১০টি স্কুল থেকে ৫০জন ও চসিক ৬নং ওয়ার্ড চান্দগাঁও এর প্রান্তিক এলাকা থেকে ২৫ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীকে মেধাবৃত্তি দেয়ারও সিদ্ধান্ত হয়। এ পর্বে মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে মেধাবৃত্তির জন্য মোট ৮ লক্ষ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মেধাবৃত্তির আবেদন ফরম শুধুমাত্র এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট অফিস হতে বিতরণ ও সংগ্রহ করতে হবে।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী সদস্য ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ, অধ্যাপক মোহাম্মদ গোফরান, ও ট্রাস্ট প্রতিনিধি মোহাম্মদ নুরুল মোস্তফা।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) স্মৃতিবিজড়িত ১৩ অক্টোবর এবং তাঁর বহুত্ববাদী আদর্শিক উত্তরাধিকার

● মোঃ মাহবুব উল আলম ●

॥ ১ ॥

সেই ১৩ অক্টোবর ১৯৮৮ ইং : ১৯৮৮ ঈসায়ী সনের ১৩ অক্টোবর। বৃহস্পতিবার। ভোরের হিমেল আমেজ কাটতে না কাটতেই শুরু হলো হাজার হাজার মানুষের মিছিল। শোকাহত মানুষের মিছিল। ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে অগণিত মানুষের মিছিল। এরা সবাই মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের পাগলপারা আশেকভক্তকূল। তাদের প্রত্যেকের বুকভরা ব্যাকুল বেদনা। অন্তর জুড়ে সীমাহীন হাহাকার। মাইজভাণ্ডার দরবারের আলোর মশাল শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) মহান পরম সত্তার সাথে শাস্ত মিলনের তরে ইহধাম ত্যাগ করে অনন্তের পথে পাড়ি জমিয়েছেন মাত্র ৬০ বছর বয়সে। মহান রাক্বুল আলামিনের অমোঘ বিধান হলেও এটা এ সময়ে সকলের নিকট ছিল অপ্রত্যাশিত। বাসে-ট্রেনে-ট্যাক্সী-মাইক্রোভর্তি জনস্রোতের একটা মাত্র প্রত্যাশা শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে শেষ বারের মতো এক নজর দেখার। তাঁদের এক পবিত্র আরজু, তাঁর জানাযা শরিফে শরীক হবার গৌরব অর্জন করা।

১৯৮৮ ঈসায়ী সনের ১৩ অক্টোবর বাংলাদেশের ইতিহাসে অপরিমেয় ভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্বেলিত একটি অবিস্মরণীয় দিন। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর এই পবিত্র জানাযা এদেশের ইতিহাসের বৃহত্তম জানাযাসমূহের অন্যতম। ঐদিন বিকেল সোয়া চারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত পর পর তিন জামাতে পাঁচ লক্ষাধিক লোক এই পবিত্র জানাযায় শরিক হন বলে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ। এছাড়া আরো লক্ষ লক্ষ লোক দিবাভাগে এসে পৌঁছাতে সক্ষম না হওয়ায় জানাযায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেননি। নামাযে জানাযা শেষে লক্ষ লক্ষ ভক্ত-অনুসারীর বুক ফাটা আর্তনাদের মধ্যে তাঁকে তাঁর হুজরা শরিফে দাফন করা হয়। এখন সেই হুজরা শরিফের উপর উঠেছে নয়নাভিরাম অথচ গাষ্টীর্ষপূর্ণ শ্বেত সমাধি-সৌধ - যে সমাধি সৌধে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা এবং ইসলামী স্থাপত্যের অনুপম সম্মিলন ঘটেছে। স্মরণকালের বৃহত্তম এই জানাযায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আগত লক্ষ লক্ষ লোকের ঢলে সয়লাব হয়ে যায় নাজিরহাট থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের পূর্ব পর্যন্ত পায় পাঁচ

কিলোমিটার এলাকা। জানাযার ঘোষিত সময়ের বহু আগে থেকেই মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের চারপাশে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। জানাযার নামায আদায়ের জন্য দরবার শরিফের মাঠ-ঘাট-রাস্তা-ঘরের অভ্যন্তর-ছাদ-কার্নিশ-অলি-গলি অর্থাৎ যে যেখানে পারে, ঠাঁই করে নেয়। নাজিরহাট থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের পূর্ব পর্যন্ত এলাকা সকাল থেকে সারারাত শোকাকুল জনস্রোতে ডুবে ছিল। মাগরিবের পরেও হাজার হাজার মানুষকে উত্তাল তরঙ্গের মতো মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে আছড়ে পড়তে দেখা যায়।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) শেষ বারের মতো এক নজর দেখার জন্যে মানুষের ভিড় সামলানো দায় হয়ে পড়ে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যরা অসীম ধৈর্য্যসহকারে উন্মত্ত জনতাকে সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যান। তাঁকে শেষ বারের মতো দেখার জন্যে অন্তহীন লাইনে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ তথা বাংলাদেশের সকল ধর্মাবলম্বী মানুষকে দেখা গেছে। নারী ও শিশুদের জন্যে আলাদা লাইন করে তাঁকে দেখার ব্যবস্থা করা হয়।

জানাযার পূর্বে ও পরে কলেমা তাইয়িবা, আল্লাহ্ রাক্বি মুহম্মদ নবী প্রভৃতি ধ্বনিতে সমগ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে এক অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ১৯৮৮ ঈসায়ী সনের ১২ অক্টোবর দিবাগত রাত ১২-২৭ মিনিটে বন্দর হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় ৯ অক্টোবর বন্দর হাসপাতালে জোর করে ভর্তি করানো হয়। কোন প্রকার চিকিৎসা গ্রহণে তাঁর চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিকিৎসক, বন্দর কর্মকর্তাবৃন্দ, তাঁর ভক্ত অনুরক্ত অনুগামীরা চেষ্টার দ্রুতি করেন নি। কিন্তু ১২ অক্টোবর সকালে একটু ফাঁক পেয়ে তিনি মানব জীবনের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুঃ দীর্ঘতর জীবনের প্রতিও চরম উদাসীনতা ও মোহহীনতার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান। সেখান থেকে কয়েকজন বন্দর কর্মকর্তার বাসায় যান। এ সময় তাঁর মুখে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘যেতে নাহি দিব’ কবিতার ‘যেতে নাহি দিব, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়’ চরণগুলো এবং ‘এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া’ গানের কলি

শোনা যায়। বন্দর এলাকা থেকে বেরিয়ে কল্লবাজার গিয়ে এক চক্কর দিয়ে ফিরে আসার পথে তাঁর অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। পথিমধ্যে তাঁকে দোহাজারী হাসপাতালে তোলা হয়। সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টা অবস্থানের পর ফেরার পথে দুলাহাজারী হাসপাতালে নিতে চাইলে তিনি তীব্রভাবে বাধা দেন। এ সময় তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান কিশোর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর কোলে ঢলে পড়েন এবং তাঁর মুখে ‘মুর্শিদ’ ‘মুর্শিদ’ শব্দগুলো শোনা যায়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে পুনরায় বন্দর হাসপাতালে আনার পর তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর তিনি অক্সিজেন সিলিন্ডার খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ কায়দায় ‘আল্লাহ্’ ‘আল্লাহ্’ জিকিরে ডুবে যান। এভাবেই তিনি রাক্বুল আল্লামিনের কাছে ফিরে যান। ফিরে যান মরমী সুফির চিরায়ত প্রেমাস্পদের কাছে।

ওফাতের পূর্বে : শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) ওফাতের দু’দিন পূর্বে ৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডা. এস এম এ মান্নান সাথে সাথে তাঁর দেহ পরীক্ষা করেন। ইসিজি করেন, পালস পরীক্ষা করেন। দেখা গেল, তাঁর দেহে মারাত্মক মাইওকার্ডিয়াল ইনফেকশান। এ ধরণের অবস্থা কোনও রোগীর দেহে পরিলক্ষিত হলে রোগীর পক্ষে স্বাভাবিকভাবে কথা বলা দূরে থাকুক, রোগী এতই দুর্বল হয়ে পড়েন যে, ঠোঁটও নাড়তে পারেন না। কিন্তু একি! শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সাবলীলভাবে সকলের সাথে কথা বলে যাচ্ছেন এবং তাঁকে চিকিৎসা করতে নিষেধ করতে বলছেন।

ডা. এস এম এ মান্নান এবং অন্যান্য ডাক্তারগণের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নিতে রাজি হলেন। এরপর তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মরফিন ইনজেকশান দেয়া হলো। পাঁচ দশ পনের বিশ মিনিট, এরপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়। একি আশ্চর্য ব্যাপার! ঘুমাচ্ছেন না কেন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) উপস্থিত ডাক্তারগণ ঘাবড়ে গেলেন। তবে কি মেডিক্যাল সায়েন্স পীর অলিদের নিকট অকেজো?

॥ ২ ॥

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সামাজিক আদর্শ :

মদীনা সনদের অনুসরণে বহুত্ববাদী সমাজ

মানুষে মানুষে সাম্য-সম্প্রীতি ছিল তাঁর জীবন-দর্শনের অন্যতম

প্রধান ভিত্তি। তিনি চেয়েছিলেন যুদ্ধ-সংঘাত-অশান্তি থেকে মুক্ত এক শান্তিপূর্ণ, কল্যাণময় বিশ্ব। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর সার্বজনীন, বিশ্বজনীন ও বহুত্ববাদী শাস্ত্রত মানবতাবাদী আদর্শ, কর্মসূচি ও কর্মনীতি ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা ও প্রকাশনার আলোকবর্তিকা। তাই তিনি অকুণ্ঠ চিন্তে বলতে পেরেছিলেন : “আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাস। সকল জাতের মিলন স্থল।” মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন : “মাইজভাণ্ডার শরিফ এক অন্তহীন মহাসাগর। অন্যথা কিছু ভাববেন না।” তাঁর এই উক্তি সাহায্যে মাইজভাণ্ডার শরিফের মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আঁচ করা যায়। বহুত্ববাদী ঐক্যবদ্ধ সম্প্রীতিপূর্ণ একটা মানব সমাজের সামিয়ানা তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণে আরো প্রসারিত করে গেছেন।

তিনি সকল সময় ভক্তদের বলতেন, ‘নামায পড়-আল্লাহ্ আল্লাহ্ কর, হালাল খাও’। ‘হালাল খাওয়ার’ মর্মার্থ, অন্যের হক বা অধিকার গ্রাস বা কলুষিত না করা। এটাই ছিল তাঁর মূল বাণী। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দরবারে ভীড় করতেন তাঁর কৃপা লাভের আশায়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবার কিছুদিন পর দরবার শরিফে এসেছিলেন তাঁর দোয়া নিতে। তিনি মিজানুর রহমান চৌধুরীকে বলেছিলেন, ‘যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পায়।’

জানা যায়, বঙ্গবন্ধু যে রাতে সপরিবারের নিহত হয়েছিলেন, সেদিন রাত আটটা থেকেই তিনি দরবার শরিফে বাঁশের মাথায় নিজ হাতে একটি কালো পতাকা ঝুলিয়ে দেন। তাঁর জীবদ্দশায় বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর বর্ণনা দেয়া স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ বিশ্বমানবতার ঐশী আলো বিতরণ করে যাচ্ছে এক শতাব্দীর অধিককাল ধরে। মানবতার এই আলোকধারায় স্নাত মানবমণ্ডলী এখানে লাভ করেন অপূর্ব প্রশান্তি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিরাপত্তা। এখানে অসংকোচে আত্মবিকাশের যে স্বর্গীয় পরিবেশ বিদ্যমান, তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এ আকর্ষণে মানুষ এখানে আসেন পতঙ্গের মতো। আসেন ভ্রমরের মতো। আসেন মৌমাছির মতো। এখান থেকে পবিত্রতা, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞানের নির্যাস আহরণ করে তাঁরা সৃষ্টি করেন মানবতার মধু। এই মধু পান করে সমৃদ্ধ হচ্ছে মানব

সমাজ, বিশ্বমানব সমাজ। কবির ভাষায়, “দেইখা যারে মাইজভাঙারে হাজার রঙের ফুল/ ঝাঁকে ঝাঁজে উইড়া পড়ে আশেক অলিকুল।” বর্তমানে ইউরোপের একাধিক অগ্রহী গবেষক মাইজভাঙারী আদর্শের মাঝে বিমূর্ত মানবতার স্বরূপ অন্বেষায় অগ্রহী হয়ে উঠেছেন। মাইজভাঙার শরিফের ঐতিহ্য এবং শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাঙারীর (ক.) মাধ্যমে বিকশিত মাইজভাঙার দরবার শরিফের সর্বসাম্প্রতিক অভিব্যক্তি এখন বিশ্বকে আকর্ষণ করে চলেছে।

॥ ৩ ॥

সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল থাকার শিক্ষা

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাঙারীর (ক.) সমগ্র জীবনটাই ছিল ঐতিহাসিক। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চর্চা, বিশ্ব মানবতার সেবা সর্বক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এক ইতিহাস। প্রচণ্ড শক্তিম্পন্ন জ্যোতিষ্ক যেমন তার চার পাশের সব কিছুকে এক অপূর্ব শক্তি ও মমতার টানে আবদ্ধ করে রাখে, তেমনি তিনি আবদ্ধ করে রেখেছিলেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে এক মমতার মাধ্যাকর্ষণে। জীবনে যিনি ছিলেন সকলের বিস্ময় উদ্বেককারী এক চলমান ইতিহাস, ইতিকালেও তিনি সৃষ্টি করে গেছেন আরেক ইতিহাস। তাঁর জানাযায় ৫ লক্ষাধিক শোকাক্ত মানুষের সমাবেশ জানাযার ইতিহাসেও এক বিস্ময়কর ইতিহাস বৈকি।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাঙারী (ক.) আজ আমাদের মধ্যে শারীরিকভাবে নেই, তবে তিনি আমাদের জন্যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে অমূল্য উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন তাঁর মহান শিক্ষা। তাঁর এই শিক্ষা মহান মাইজভাঙারী শিক্ষারই মর্মবাণী। এ শিক্ষা সত্য-ন্যায়ের প্রতি অবিচল থাকার শিক্ষা। এ শিক্ষা মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা। এ শিক্ষা স্বদেশ ও স্বদেশের মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা। এ শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর ইঙ্গিত বিকাশের শিক্ষা। তাঁর এ শিক্ষা এবং নিজেকেই এর দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করার ইতিহাসের মধ্যেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

মাইজভাঙারীয়া তুরিকার ব্যাপ্তি ও বিশালতা সম্পর্কে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাঙারীর (ক.) অমর উক্তি : “মাইজভাঙার ইজ্ এ্যান ওস্যান-মাইজভাঙার একটি মহাসমুদ্র।” মহাসমুদ্রের সাথে মাইজভাঙার দরবার শরিফের তুলনার মধ্যে রয়েছে এই তুরিকার বিশালতার আভাস। মহাসমুদ্র মানবজাতির অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান অবলম্বনই শুধু নয়, এই মহাসমুদ্র সব কিছুকে গ্রহণ করে তাকে জারক রসে জারিত, পরিশোধিত ও উপযোগী সামগ্রী হিসেবে

উপস্থাপন করে পৃথিবীর কাছে। মাইজভাঙার দরবার শরিফও কি তেমনি একটি স্থান নয়? এখানে আলো হয় অধিকতর উজ্জ্বল। ভালো হয় আরো ভালো। খারাপ এখানে এসে খারাপ থাকতে পারে না। এক অবর্ণনীয় জিয়ন কাঠির স্পর্শে প্রতিটি চিত্ত এখানে হয়ে উঠে মানবতার কল্যাণধর্মী উপাদান। মানুষকে একই দৃষ্টিতে একইভাবে গ্রহণ করে এক কাতারে সামিল করার যে আবেদন মাইজভাঙার দরবার শরিফ থেকে প্রতিনিয়ত উৎসারিত হয়, সে আবেদন সময় কিম্বা স্থানের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। মানবজাতির সামগ্রিক ঐক্যের যে চেতনা মানব সভ্যতা বহুদিন ধরে দেখছে, সে ঐক্যের পথে সকল প্রতিবন্ধকতা তথা অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মগত ও আচারগত বৈষম্য দূর করে মানুষকে পরস্পরের কাছে আসার তাগিদ দেয় মাইজভাঙারীয়া তুরিকার বহুত্ববাদী সমাজ দর্শন।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাঙারী (ক.) তাঁর পূর্বসূরীদের এই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে মানবতার খেদমতের সড়ককে করেছেন আরো সুবিস্তৃত। মহান রাব্বুল আলামিনের অভিন্ন সৃষ্টি হিসেবে মানব জাতিকে এক অভিন্ন মানবিক সূত্রে আবদ্ধ করার যে বহুত্ববাদী নীতি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) প্রবর্তন করেন, তার ধারাবাহিকতায় প্রোজ্জ্বল মাইজভাঙার দরবার শরিফ। মানবতার যে প্রদীপ মাইজভাঙারী আদর্শের তাপসরা বহন করে চলেছেন, সে প্রদীপের আলোয় আমাদের স্বদেশ, বাংলাদেশ তথা সমগ্র পৃথিবী উদ্ভাসিত হোক। বহু ফুলের সমাবেশে যেমন সৃষ্টি হয় মনোরম বাগান, তেমনি বহুত্ববাদী সমাজ ও বিবিধ প্রকার মানব-পুষ্পের এক সুন্দর বাগান বটে!

সুফি উদ্ধৃতি

- যে ব্যক্তি আল্লাহুতা'য়ালার সত্যিকারের পরিচয় লাভ করেছেন, তিনি কখনো একমাত্র আল্লাহুতা'য়ালার জিকিরের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মুখ খুলতে পারেন না।
- আল্লাহুতা'য়ালার যাদের ভালবাসেন তাঁদের তিনটি স্বভাব দান করে থাকেন। ক. সমুদ্রের দানশীলতার মত দানশীলতা, খ. সূর্যের দয়ার মত দয়া এবং গ. জমিনের নশতার মত নশতা।
- নেককারের সংসর্গে থাকা, নির্জনে বসে নেক কাজ করার চেয়ে উত্তম। আর বদকারের সংসর্গে থাকা বদকাজ করার চেয়ে নিকৃষ্ট।

--- হযরত বায়জীদ বোস্তামী (রহ.)

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) মানবতা, সম্প্রীতি ও মানব কল্যাণের বিশ্ববাতিঘর

● আলোকধারা বিশেষ প্রতিবেদন ●

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সব মানুষের জন্য এক পরম শান্তির আশ্রয়। জগৎ-জীবনের নানা সংকট এবং আত্মিক সংকটের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর কাছেই মিলে পথের দিশা। তিনি ‘বিশ্বঅলি’ বলেই মহান আল্লাহুতায়ালার শান ও মর্যাদার রঙে রঞ্জিত। ঐশি রহমতের ধারার সন্ধান তাঁর কাছেই মিলে। কারণ তিনি বিশ্বব্যাপী খোদাতায়ালার মঙ্গল ও শৃংখলার বিতরণকারী অলি-হিসেবে নিজেকে বিস্তৃত করেছেন। মহান আল্লাহুতায়ালার নৈকট্য অর্জনে এবং বেলায়তের সুউচ্চ শিখরে পৌঁছার জন্য তিনি নির্বাচিতই ছিলেন। তিনি ছিলেন মাদারজাত অলি আল্লাহ্, তাসাওউফের নিগূঢ় তত্ত্বে বলা হয় এধরনের অলি আল্লাহ্’র বেলায়ত অর্জন মহান আল্লাহ্’র ইচ্ছায় জন্মসূত্রেই সাধিত হয়। তাঁর একটি পবিত্র বাণী যা খোদা প্রেমিক সবাইকেই আলোকিত করে। তা হলো, শাহানশাহ্ (ক.) বলেছেন, ‘আমাকে বুঝতে হলে কুরআন দেখুন।’ সহজেই যে বেলায়ত জন্মসূত্রে তাঁর প্রাপ্য ছিলো, তিনি সহজে তা নেন নি। কিন্তু নিতে পারতেন। তাঁর বদলে তিনি যে কঠোর সাধনা, তপস্যা, ধ্যান, কষ্টের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, তা সবার জন্য একটি অনন্য প্রেরণা ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা জ্ঞানী ও খোদাপ্রেমী মানুষেরা সহজেই বুঝতে পারেন। কঠোর সাধনাই পবিত্র সত্যের সন্ধান দেয়। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর হেরা গুহায় যে কঠোর ধ্যানমগ্ন সাধনা এবং সেই সাধনার মধ্য দিয়ে মানবজাতির জন্য পবিত্র ঐশি গ্রন্থ কুরআনুল করিম প্রাপ্তির যে মহাসৌভাগ্য তাঁরই পবিত্র আলোক সম্প্রদায় যেনো বিচ্ছুরিত হয় শাহানশাহ্ অলি হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর এই পবিত্র বাণীতে।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) মানুষকে নামায, আল্লাহ্’র যিকির, সৎ ও পূতপবিত্র জীবনযাপনের দ্ব্যর্থহীন তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ্’র নৈকট্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আরো যে বৈশিষ্ট্য তা হলো একজন অলি আল্লাহ্’র মধ্যে মহান আল্লাহ্’রই পবিত্র রঙ আপতিত হয়। পবিত্র বেলায়তি ধারায় এই রঙের উজ্জ্বলচ্ছটা যে কতো তীব্র হতে পারে তা তাসাওউফের জ্ঞানে আলোকিত মানুষ ছাড়া কারো পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) আল্লাহ্’র রঙেই রঞ্জিত হয়েছিলেন। ফলে তিনি হাল, জজবা সহ বিভিন্ন সময় খোদায়ী

রঙেরই বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন। আল্লাহ্’র রঙ কী, এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাধারণ তফসিরকারগণ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন না। মূলতঃ সাধারণ ব্যাখ্যা হচ্ছে, যে সব পবিত্র এবং আল্লাহ্’র নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষকে দেখলে আল্লাহ্’র কথা স্মরণ হয় এবং যারা মহান স্রষ্টার পবিত্র গুণাবলীতে ভূষিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যে ঐশিসৌন্দর্য ও পবিত্রতার সারউদ্ভাস ঘটে তাকেই বলা যেতে পারে আল্লাহ্’র রঙ। আল্লাহ্’র রঙ অসীম উজ্জ্বলতা, অকল্পনীয় পবিত্রতা, সুগভীর প্রেম ও দয়া সহ আল্লাহ্’র যাবতীয় গুণাবলীর প্রখর বিচ্ছুরণে ব্যাখ্যাভিত্তিক মহিমাময়। এই রঙের প্রলেপন, প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও বিচ্ছুরণ সবই শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর মধ্যে ঘটেছিলো। এরই জন্যে তিনি আসামানে বসে দুনিয়া পরিচালনার কথা বলতে পারেন। তিনি সবাইকে নামায পড়ার তাগিদ দিয়েছেন। পবিত্র মুখে তিনি উচ্চারণ করেছেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্ (দ.)” সবকিছুর মূল। কাজেই এমন একজন অলি-আল্লাহ্ যাঁর বেলায়তের স্তর বিশ্ব চরাচর ছাড়িয়ে আকাশ অতিক্রম করেছে তিনিতো সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ্’র রঙে রঞ্জিত হবেনই।

এই প্রসঙ্গে তাই পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৩৮ নং আয়াতটি তুলে ধরা যেতে পারে। এতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন: ‘আমরা শুধু আল্লাহ্’র রঙেই রঞ্জিত। আল্লাহ্’র চেয়ে সুন্দর রঙ আর কে দিতে পারে? আমরা শুধু তাঁরই দাসত্ব করি।’

মহান মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সূচনা যে মানবতাবাদী দর্শনের মাধ্যমে তা সকল ধর্মের মানুষকেই গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। মূলতঃ ধর্ম হচ্ছে ‘সন্দেহাতীত সত্য’; মহান স্রষ্টার সন্ধান ব্যাকুল সৃষ্টির আরাধনা। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের স্বরূপ উন্মোচক, লিখিতরূপে রুহানি ভাষ্যকার, খাদেমুল ফোকারা অসিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর রচিত পবিত্র ‘বেলায়তে মোতলাকা’য় ধর্মের স্বরূপ তুলে ধরেছেন মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আলোকে। তিনি লিখেছেন: ‘তাসাওউফে ইসলাম নামের প্রস্থের ২৪৯-২৫০ পৃষ্ঠায় তৌহিদে আদ্বীয়ান বা ধর্মত্রিক্য সম্পর্কে লেখা রয়েছে। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, যত রকমের ধর্ম আছে সেগুলোতে অবস্থা অনুসারে বিভিন্নতা থাকলেও তারা মূলতঃ অভিন্ন। বাইরের দিক থেকে একটি ধর্ম অন্যটির মতো নাও হতে পারে,

এই পার্থক্যটা বাহ্যিক। কিন্তু যাকে ধর্ম বলে ডাকা হয়, এই ধর্মবস্ত্র অভিন্ন ও এক। যেহেতু সমস্ত ধর্মের লক্ষ্যস্থল খোদা। যদিও বিভিন্ন ধর্মের সাথে বিভিন্ন গোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট, এটাও আল্লাহুতায়ালারই ইচ্ছা। এই মতবাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন হযরত মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহ.), হযরত উমর ইবনুল ফরিদ (রহ.), হযরত জালালুদ্দিন রুমী (রহ.), হযরত আবদুল করিম জিলি (রহ.), হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) তাইপুরী-ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন.....।’ (বেলায়তে মোতলাকা, প্রথম পরিচ্ছেদ)।

সাধারণ মানুষের কাছে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মানবতাবাদী বার্তা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর অবদানকে অভূতপূর্ব বলে আখ্যায়িত করেন গবেষকরা। গবেষকদের অভিমতঃ ‘সুফিবাদের একটি সমৃদ্ধ শাখা হচ্ছে মাইজভাণ্ডারী দর্শন। হযরত গাউসুল আযম শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রবর্তিত এই দর্শনে অর্গলমুক্ত ঐশী প্রেমবাদের কথা বলা হয়েছে অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে। এই দর্শনে সুস্পষ্টভাবে ধর্মসাম্য, মানবজাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনে ভালোবাসা এবং বিশ্ব মানবতার মুক্তির কথা বলা হয়েছে। যার ফলে সকল ধর্মের, সকল শ্রেণীর মানুষ সত্য ও সুন্দরের সন্ধানে নির্ধ্বংস ছুটে গিয়েছেন মাইজভাণ্ডারী দরবার শরিফ। লক্ষ লক্ষ অমুসলিম দরবার শরিফে গিয়ে বিমুগ্ধচিত্তে মুক্তির ঠিকানা খুঁজেছেন, আশাও পূরণ হয়েছে তাঁদের। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিও হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং সারাটি জীবন এই দর্শনের আলোয় বিপথগামী মানুষদের মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছেন। এসব সাধকের মধ্যে গুরুদাস ঠাকুর, কালাচাঁন সাধু, রমেশ শীল, ধনঞ্জয় বড়ুয়া এবং মাইকেল পিনেরুর নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

আর মানবতাবাদী এই দর্শনের প্রবক্তা হযরত গাউসুল আযম শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর সার্থক উত্তরসুরি হচ্ছেন শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)। অসিয়ে গাউসুল আযম শাহসুফি মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক মাইজভাণ্ডারী দর্শনের স্বরূপ উন্মোচনের পর প্রত্যন্ত অঞ্চলের গণমানুষের কাছে এই দর্শনের আবেদনকে স্থায়ীকরণে যার অবদান সিংহভাগ তিনি হচ্ছেন, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)।” (আলোকধারা, একাদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ৯)

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর দরবারকে অব্যাহত রেখেছিলেন সকল ধর্মের মানুষের জন্য। আল্লাহুতায়ালার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মর্যাদা ও

মানবতার প্রতি তাঁর দরদের কথা অকুণ্ঠচিত্তে আজ সবাই স্মরণ করেন। আর সেই ভালবাসার বহমান ধারা হিসেবে তাঁরই নামে অর্থাৎ শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড মানুষের সেবায় বহমান রয়েছে। মহান আল্লাহর রহমতের প্রতীক হিসেবে এই পবিত্র দায়িত্বের পতাকা যোগ্য হাতে আকাশে উড়তীন করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন পরম শ্রদ্ধেয় মাওলা হুজুর, মাইজভাণ্ডারী দরবার শরিফ গাউসিয়া হক মনজিলের সম্মানিত সাজ্জাদানশীন শাহসুফি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ)। এখানে তাই এখনো কোনো ধর্মের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ নেই। বিশ্বনিয়েস্তা মহান আল্লাহর কাছে সকৃতজ্ঞ প্রার্থনা, সম্প্রীতির বিশ্ব ও সমাজ গড়তে মানুষের প্রতি নানামুখী সহায়তা, গবেষণা, ভালচিন্তা ও সৃজনশীলতার এক কর্মক্ষেত্র ভূবন যেনো সদাজাগ্রত হয়ে আছে এখানে। বিভিন্ন জনের লেখায় এবং গবেষকদের গবেষণায় আজ বিশেষ করে যে কথাটি আসছে তা হলো, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সকল ধর্মের মানুষের সমন্বয়ে একটি সম্প্রীতিপূর্ণ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে সব সময় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর কাছে ধর্মের পরিচয়ের চেয়েও মানুষ পরিচয়টি ছিলো প্রধান বিবেচ্য বিষয়। যার কারণে দ্বিধাহীনভাবেই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়েছে সেই মহান বাণী: ‘আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাস, আল্লাহর ঘর, সকল জাতির মিলন কেন্দ্র।’

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) আধ্যাত্মিক মর্যাদা বা বেলায়তের শানে যে বিশাল মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তা তাঁর পবিত্র কালাম বা বাণী পাঠ করলে অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেছেন, ‘আকাশের উপরে বসে আমি মানুষের কাজকর্ম দেখি আর উপরের দিকে আল্লাহর সাথে কথা বলি।’

তাঁর পবিত্র কালাম: ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন রাসূলের রহমতের সীমানা জুড়ে আমার বেলায়তি কর্মকাণ্ড।’ তাঁর পবিত্র কালাম: ‘আমার একটা প্রশাসন আছে। বিশ্বের পাঁচশত কোটি মানুষকে আমি পরিচালিত করি।’ তাঁর পবিত্র কালাম: ‘হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহু আল্লাহু জিকির কর, সব সমস্যা মিটে যাবে।’ তাঁর পবিত্র কালাম: ‘সকল গুণের মালিক তো আল্লাহু, তাই সকল প্রশংসাও আল্লাহু, আলহামদুলিল্লাহু।’ তাঁর পবিত্র কালাম: ‘বিশ্বের কোথায় কি হচ্ছে সকলই আমার জানা।’

একথা আজ সকল আশেক-ভক্ত ও গবেষকদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে যে, ‘শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সব সময় অধ্যাত্ম সাধনায় বিভোর থাকলেও সমাজ বাস্তবতা থেকে কখনো আড়াল করে রাখেন নি নিজে। সার্বিক ও সার্বজনীন কল্যাণ এবং শ্রেয়োবোধ ছিল সর্বদা তাঁর

বিবেচ্য বিষয়। মানবিক জাগৃতি এবং মানবিক শ্রেষ্ঠত্বকে সুসমায়ম ও শ্রুতির অনুগ্রহ সৌন্দর্যে অভিব্যক্তিময় করার জন্যেও তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তর সচল।’

এক নজরে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বিশেষত্ব

১. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রপৌত্র, হযরত বাবা ভাণ্ডারীর দৌহিত্র এবং অছি-এ গাউসুল আযমের রক্ত ও বেলায়েতের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী হিসেবে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি রূপে তাঁর আবির্ভাব।

২. উল্লিখিত পবিত্র ত্রিধারার সংগম স্থলের অপূর্ব সৃষ্টি হিসেবে শুরু থেকেই তাঁর ব্যতিক্রমী আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব সংশ্লিষ্ট মহলের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

৩. বাবার জীবদ্দশায় তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমার স্ক্রুণ এবং স্বতন্ত্র সত্তায় বিকাশের সংকেত অনুধাবন করে, একে মর্যাদাপূর্ণভাবে আমলে নিয়ে তদীয় পিতা কর্তৃক স্বতন্ত্র মনজিলে স্বতন্ত্রধারায় বসবাসের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা।

৪. প্রায় প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত তাঁর আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ জীবনাচরণ, শতশত কারামত এবং হাকিকতী সফর সমূহকে কেন্দ্র করে বিংশ শতাব্দীর ৬ দশক থেকেই তিনি রীতিমত কিংবদন্তিতে পরিণত হন।

৫. সমাজ জীবনের প্রায় সর্বস্তরের, বিশেষতঃ রাষ্ট্র, সরকার ও বিদ্বৎ সমাজের স্বনামধন্য বিশিষ্টজনদের মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলোকে আল্লাহ ও রাসুলের পথে আকৃষ্ট ও পরিচালিত করার ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন।

৬. জীবদ্দশায় তদীয় একমাত্র পুত্রকে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী মনোনয়ন এবং তাঁর হেকমতি নির্দেশনায় তদীয়পুত্র কর্তৃক পিতার আরদ্ধ কার্যক্রমকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য ‘শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট’ গঠন এবং একবিংশ শতাব্দীর আলোকে এ সংগঠনকে পরিচালনার হেকমতপূর্ণ গুরুদায়িত্ব অর্পণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার স্বরূপ উন্মোচন ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যে শুভ সূত্রপাত করেছিলেন, তার সৃজনশীল বিকাশমান ধারার আরদ্ধ কাজটি নতুনভাবে নতুন মাত্রিকতায় জীবন ঘনিষ্ঠভাবে হেকমতপূর্ণ শুদ্ধতম ধারায় প্রবহমান রেখেছে SZHM Trust। অগ্রহী পাঠক এতদবিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন এর নিম্নোক্ত ওয়েব সাইটে-
www.sufimaizbhandari.org.bd এবং www.facebook.com/szhmtrust

খোশরোজ ও উরস্ শরিফ:

প্রতি বছর ১০ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল

হক মাইজভাণ্ডারীর বার্ষিক খোশরোজ শরিফ এবং ২৬ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর বার্ষিক উরস্ শরিফ পালিত হয়।

[শাহানশাহ্ বাবাজানের পুরা জীবনটাই ছিল একটা আধ্যাত্মিক চলমান অভিধান। যা রীতিমতো গবেষণার উপাদানে ভরপুর। এই বিবেচনা বোধ থেকেই এ জীবন-পঞ্জি পরিচালনা।]

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।
১৯২৮-১৯৮৮

১৯২৮- জন্ম ২৫ ডিসেম্বর, ১০ পৌষ, ১৩৩৫।

বাবা: অছি-এ-গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মা: মোসাম্মৎ সৈয়দা সাজেদা খাতুন।

দাদা: শাহসুফি সৈয়দ ফয়জুল হক।

বড় দাদা: মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী।

নানা: কুতুবুল আকতাব হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান বাবা ভাণ্ডারী।

১৯২৯- ২ জানুয়ারী- সপ্তম দিবসে আকিকা অনুষ্ঠান। বহুদিন পর দরবারে সম্মিলিত একক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান এর শুভ সূচনা।

১৯৩২- গৃহশিক্ষক মৌলভী মোজাম্মেল হকের নিকট ধর্মীয় শিক্ষার হাতেখড়ি।

১৯৩৫- খতনা পরবর্তী বরণ অনুষ্ঠান উদযাপন। নানা হযরত বাবা ভাণ্ডারীর আশীর্বাদ লাভ। তৎকালীন স্থানীয় আহমদিয়া জুনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি।

১৯৪১- ফটিকছড়ি করোনেশান হাই স্কুলে ভর্তি।

১৯৪২- নানুপুর আবু সোবহান উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি।

১৯৪৫- নানুপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পাস।

১৯৪৬- চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি।

১৯৪৮- ৩১ আগস্ট, কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (এস.এস.সি) পাস।

১৯৪৯- চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি।

১৯৫১- চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই.এ (এইচ.এস.সি) পাস। বোয়ালখালীর কানুনগোপাড়া কলেজে বি.এ শ্রেণীতে ভর্তি।

১৯৫৩- কানুনগোপাড়া কলেজে বি.এ টেস্ট পরীক্ষাকালে জজবিয়াত হালতে পরীক্ষা-হল ত্যাগ। জাগতিক প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার এখানেই সমাপ্তি। পারিবারিক মামলায় হাজিরা দেওয়ার জন্য ঢাকা গমন।

১৯৫৪- পিতা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর ব্যবস্থাপনায় আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতিব শায়খুল হাদীস মাওলানা ছফিরুর রহমান হাশেমীর হাতে আনুষ্ঠানিক সবক গ্রহণ।

১৯৫৫- ২৮ জানুয়ারী-মঙ্গলবার ফটিকছড়ির দাঁতমারা ইউনিয়নের স্বনামধন্য জমিদার বদরুজ্জামান চৌধুরীর [বদন সিকদার] কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ সৈয়দা মনোয়ারা বেগমের সাথে শুভ পরিণয়।

১৯৬৬- ৯ মাঘ, ২২ জানুয়ারী- গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তদীয় পিতা হতে আনুষ্ঠানিক খিলাফত লাভ এবং তদীয় পিতার কাছে সংরক্ষিত গাউসে পাকের খয়েরী রং এর চাদরটি তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ।

১৯৬৭- এপ্রিল, চিকিৎসার জন্য পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি।

১৯৬৯- ১৯ ডিসেম্বর, একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান এর জন্ম।

১৯৭৩- (৩০ আষাঢ়- ১৩৮০) পিতার তত্ত্বাবধান-মুক্ত অঙ্গনে তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা বিকাশের স্বতন্ত্র ধারার দ্বার উন্মুক্ততার প্রয়োজনে পিতা কর্তৃক গাউসিয়া আহমদিয়া মনজিল থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র সত্তায় স্বতন্ত্র মনজিল-হাসান বাগে (পরে হক মনজিলে রূপান্তর) সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা।

১৯৭৪- একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান সম্পর্কে হাকিকতী মন্তব্য- “আমার হাসান মিয়া না বাঁচলে দুনিয়াতে কোন শিশু বাঁচবেনা।”

৬ এপ্রিল, তাঁর প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহের প্রতি অছিমে গাউসুল আযমের স্বপ্নাদেশ।

২৭ আশ্বিন (১৯৭৪) বাবা ভাণ্ডারীর খোশরোজ উপলক্ষে স্বীয় মনজিলের সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ, আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতিত্ব ও মুনাজাত পরিচালনা।

১৯৭৬- ১০ পৌষ, গাউসিয়া হক মনজিলের উদ্যোগে প্রথম খোশরোজ অনুষ্ঠান। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে দায়রা শরিফ গড়ে তোলার আহবান।

১৯৭৮- গতানুগতিক ধারায় বায়াত করা বন্ধ করে দেন।

১৯৮২- ২ মাঘ, তদীয় পিতা ও মুর্শিদ অছিমে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর ওফাত।

১৯৮২- ডিসেম্বর, তাঁর জীবনী ‘শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী’ গ্রন্থের প্রকাশ। লেখক: জামাল আহমদ সিকদার।

১৯৮৩- ৭ সেপ্টেম্বর, দরবারের প্রতি খেদমতের, আত্ম নিবেদনে তদীয় প্রধান খলিফা সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহের কিংবদন্তিতুল্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর হাকিকতী মন্তব্যঃ “ইনি [বখতেয়ার শাহ] আমার বাবাজানের খলিফা, গাউসুল আযমের শানে, বাবাজানের শানে ২৫টি বই লিখেছেন।”

১৯৮৪- ২৪ ডিসেম্বর, শাহানশাহ বাবাজানের নির্দেশে হক মনজিলের ছয়তলা মেহমান খানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হক মনজিলের এন্ট্রিজামিয়া কমিটির সভাপতি ও তদীয় প্রধান

খলিফা সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহ।

১৯৮৫- গাউসিয়া হক মনজিলের মুখপত্র ‘আলোকধারা’র প্রকাশ।

১৯৮৫- ৫ নভেম্বর, গাউসিয়া হক মনজিলের পুকুর সৈঁচে সবগুলো মাছ এলাকার দোকানদার, কুলালপাড়া ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান।

১৯৮৬- ২২ নভেম্বর, তাঁর স্বগতোক্তি : “এ পুকুরটা ভরাট করে ঘর তৈরি করতে হবে। এখানে অনেক অনেক লোক আসবে।”

১৯৮৭- ১৫ জুলাই- তাঁর বেশী ব্যবহার্য বড় চেয়ারটা উল্টিয়ে রেখে একদিন পর পুনঃস্থাপন।

১৯৮৭- ২৩ জুলাই, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয়ে মিজানুর রহমান চৌধুরীর মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে তাঁর কাছে এসে দোয়া কামনা।

১৯৮৭- আগস্ট, চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী পত্রিকার সম্পাদক ও সাবেক গণপরিষদ সদস্য, অধ্যাপক মুহাম্মদ খালেদ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে যুগপৎ মনোবল ও কর্মশক্তি হারিয়ে অবশ হাত নিয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফে শাহানশাহ বাবাজানের হুজরায় এসে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে উঠেন, “বিকলাঙ্গ, বেইজ্জতীর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।” তাঁর ফরিয়াদ শুনে শাহানশাহ বাবাজান মুখে কিছু না বলে একটা গ্যাস লাইটার উজ্জ্বল শিখায় দীর্ঘক্ষণ জ্বালিয়ে রাখেন। উল্লেখ্য, এ ঘটনার পর খালেদ সাহেব প্রয়োজনীয় সুস্থ হয়ে উঠে পুনরায় সাংবাদিকতা ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে চট্টগ্রামের একজন অবিসংবাদিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবীতে পরিগণিত হয়ে ওঠেন।

১৯৮৭- ৭ অক্টোবর, প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর পুনরায় দরবার শরিফে এসে শাহানশাহ বাবাজানের দোয়া, দয়া ও বিশেষ কৃপা লাভের ঐকান্তিক নিবেদন। বাবাজান তাঁর হুজরা শরিফে প্রধানমন্ত্রীকে টানা ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট একান্ত সোহবতে অবস্থান এর সুযোগ দেন। এ সময়েই সরকার ও জনগণের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর নিম্নোক্ত পবিত্র কালামটি প্রকাশ পায়। “সন্তান কষ্ট পেলে বাবা মা’রও কষ্ট হয়। দেশের মানুষ কষ্ট পেলে সরকারেরও কষ্ট হয়। জনগণতো আপনাদের সন্তানের মতো, তাদের যাতে কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। মনে রাখবেন, জনগণের সুখ-শান্তিতেই সরকারের শান্তি ও স্থিতি।”

২৮ অক্টোবর- হুজরা শরিফের পূর্বপাশের বাঁশের বেড়া পুকুরে ফেলে দেয়ার নির্দেশ।

১ ডিসেম্বর- পার্শ্বস্থ ভাণ্ডার শরিফ আহমদীয়া প্রাইমারী স্কুলে ১০০ ও ২০০ ওয়াটের ২টি বাব্ব লাগানোর নির্দেশ।

৯ ডিসেম্বর- ৬ তলা ভবনের ৪ তলায় নিজের বসার চেয়ারখানা

উল্টিয়ে রাখেন।

২৬ ডিসেম্বর- শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) গ্রন্থের ২ সংস্করণের প্রকাশ।

১৯৮৮- ১ জুন, জীর্ণ কাচারি ঘরটি তাঁর অনুমতিক্রমে পুনঃনির্মাণের নিমিত্তে ভেঙ্গে ফেলা।

২০ ফেব্রুয়ারী- হুজরা শরিফের সামনের ঝাড়বাতি দুটো কাচারিতে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ।

৬ জুন- তাঁর মা-জানের বার্ষিক ফাতেহা শরিফের রাতে সামা মাহফিলে উপস্থিত এবং মাহফিল শেষে দাঁড়িয়ে দুহাত ছড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘক্ষণ মুনাজাত এবং ফজলী আমের তাবারুক বিতরণের নির্দেশ প্রদান।

১০ আগস্ট- খুব ভোরে চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে বড় মাপের পাঙ্গাস মাছ কিনে দরবারে রেখে পুনরায় শহরে গমনের সময় গাড়ী রাখার পাকা গ্যারেজটা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ এবং একইসাথে উল্লিখিত দুই কক্ষকে দেখিয়ে পবিত্র কালাম- “এগুলো আল্লাহর ঘর।”

১০ সেপ্টেম্বর, গ্যারেজ ভাঙ্গার কাজ শেষে হুজরা শরিফের সামনে পেছনের দেয়াল ভাঙ্গার প্রক্রিয়া শুরু হলে শ্রেণীবদ্ধ আফছার উদ্দীনের জিজ্ঞাসার জবাবে কালাম করেন- “এখানে শাহী দরবার হবে তাই।”

চট্টগ্রাম শহরে প্রায় সকল বিশিষ্ট ভক্ত ও আত্মীয়ের বাসায় দেখা দিয়ে আসেন।

১২ সেপ্টেম্বর, চট্টগ্রাম বন্দরের অফিসার্স কলোনীর বাসায় ক্যাপ্টেন রমজান আলী সাহেবের বড় ছেলে রিজোয়ান আলীকে ভিডিও করার সম্মতি প্রদান। উল্লেখ্য, সস্ত্রীক ক্যাপ্টেন রমজান আলী, খালেকুজ্জামান সাহেব এবং খাদেম রফিকের উপস্থিতিতে ২০-২৫ মিনিটের ধারণকৃত এ অডিও ভিডিওটি বর্তমানে মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠীর হাসান শরিফ খান এর কাছে সংরক্ষিত আছে।

১ অক্টোবর, সকালে কারযোগে হুজরা শরিফ থেকে শহরে পাঠানটুলীর আকমল খানের বাসায় অবস্থান। হাদিয়া কেনার জন্য বাজারে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনার প্রেক্ষিতে সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহকে লক্ষ্য করে তাৎপর্যপূর্ণ পবিত্র কালাম- “এবারে কদিন ধরে বহু গরু-মহিষ জবেহ করতে হবে। অনেক লোক সমাগম হবে।” ৬ অক্টোবর, সকাল ১১ টায় আকমল খানের বাড়ি থেকে উদোম শরীরে লুঙ্গি পরা অবস্থায় নিজ টয়োটা গাড়ি করে বেরিয়ে পড়েন।

৮ অক্টোবর, রাঙ্গামাটি শহরের স্বর্ণটিলায় তফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর ছোটবোনের বাসায় অবস্থানকালে গভীর রাতে ৪০ মিনিটের জন্য হৃদস্পন্দন পুরাপুরি বন্ধ।

৯ অক্টোবর, রাঙ্গামাটি থেকে চট্টগ্রাম শহর অভিমুখে যাত্রাকালে গাড়ীতে বাদশা হাজীকে পাশে বসিয়ে পবিত্র হুজুর দোয়া

পড়তে বলে একইসাথে নিজেও পড়তে থাকেন, ‘আল্লাহুমা লাঝ্বায়েক, লা শরিকা লাকা লাঝ্বায়েক।’ শহরে এসে হযরত আমানত শাহ (রহ.) এর মাযার ও পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে গমন। হাসপাতালে ভর্তি করাতে চাইলে বিকেলে ভর্তির কথা বলে চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষিণ অফিসার কলোনিতে ক্যাপ্টেন রমজান আলীর বাসায় গমন। এ বাসায় দুপুরে প্রায় ৩৫ জন ভক্ত-শিষ্যের সাথে জীবনের সর্বশেষ আনুষ্ঠানিক ভোজনপর্ব শেষে বারংবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘যেতে নাহি দেব’ কবিতার কটি পঙতি আবৃত্তি এবং গুনগুন করে গাইলেন ‘এই যে দুনিয়া কিসেরো লাগিয়া’ গানটি।

বিকেল সাড়ে তিনটায় আবার গেলেন হযরত আমানত শাহ (রহ.) এর মাযার এবং পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে। ফেরার পথে পুনরায় আমানত শাহ (রহ.) এর মাযারে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ; কিন্তু গাড়ীর চাকা নষ্ট হওয়ায় সকলে মিলে গাড়ীকে ঠেলে বন্দর হাসপাতালে নিয়ে অনেকটা জোর করে তাঁকে ১ নং কেবিনে ভর্তি। ইসিজি রিপোর্টে দেখা গেল গুরুতর হার্ট এ্যাটাক কিন্তু বাহ্যিকভাবে রোগের কোন লক্ষণ নেই; কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন স্বাভাবিকভাবে। প্রধান চিকিৎসক ডা. আবদুল মান্নানের তত্ত্বাবধানে ৬ ঘন্টা পর পর ২ বার মরফিন ইনজেকশন প্রয়োগ, কিন্তু ঘুমের কোন লক্ষণ নেই। রাত ১০ টায় স্বেচ্ছায় ঘুমিয়ে পড়েন।

১০ অক্টোবর, সোমবার- সকাল ১১ টায় মেডিকেল বোর্ড গঠন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি নারাজ, এমনকি বন্দর হাসপাতালও ছেড়ে দিতে চান। অগত্যা ঘুমের জন্য হাইডোজ সিডাকসিন ৪ ঘন্টা অন্তর অন্তর। কিন্তু এর পরও ঘুমের কোন লক্ষণ নাই। চিকিৎসকরা হতবাক; চিকিৎসা বিজ্ঞান ফেল। নিরু্ধম রোগী নিজ কাজে ব্যস্ত। ডাক্তারদের, বিশেষ করে তদীয় ছোট ভাই ডাঃ সৈয়দ দিদারুল হকের নির্দেশে গেটে তালা লাগিয়ে বাইরে পাহারার ব্যবস্থায় রোগীর স্বগতোক্তি- ‘আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেলে তালা দিয়ে কি রাখা যাবে?’

১১ অক্টোবর, মঙ্গলবার- নিউ মার্কেট থেকে একজোড়া হ্যাণ্ড গ্লাভস আনয়ন। পছন্দ না হওয়ায় বদলানোর ঘটনা। সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির। হযরত আমানত শাহ (রহ.) দরগাহ এবং সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার জন্য ছটফট অবস্থা, কিন্তু বের না হয়ে জিকিরে নিমগ্ন।

১২ অক্টোবর, বুধবার- ভোর চারটায় ১ নং কেবিন থেকে বেরিয়ে পাশে ২নং কেবিনে গিয়ে সহধর্মিনীকে নামায পড়তে ডেকে দিলেন এবং পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে একগ্লাস হরলিঙ্গ খাওয়ার নির্দেশ ও একটি আপেল প্রদান। অতঃপর সহধর্মিনীর সম্মতি চেয়ে ‘হাসানকে নিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। আপনার নিকট ফিরে আসবো।’ বলে সকাল ৭টায়

কেবিন থেকে বেরিয়ে গাড়ী আনতে নির্দেশ, চালক নাজিমের ৫১৫২ গাড়িতে শাহজাদাকে সামনের সিটে বসিয়ে নিজে পেছনের সিটে বসে পড়েন। পাশে আবদুল মতিন চৌধুরীকে নিয়ে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত ঘুরে ক্যাপ্টেন রমজান আলীর বাসায় এসে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা ও চা মিষ্টি কবুল। অতঃপর আলী নবী চৌধুরীর কন্যার রেওয়াজ অবস্থায় হারমোনিয়াম চেয়ে নিয়ে নিজে দরদভরা কণ্ঠে গাইতে শুরু করেন-

এই যে দুনিয়া, কিসেরও লাগিয়া/ এত যত্নে গড়াইয়াছেন সাঁই।
ছায়াবাজি পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ

যেমনি নাচাও, তেমনি নাচি/ পুতুলের কী দোষ-...

আমার মনে এই আনন্দ,/ (আমি) কেবল আল্লাহ্ তোমায়
চাই।...

তুমি বাঁচাও, তুমি মার/ আল্লাহ্ তুমি বিনে কেহ নাই ॥

সকাল ১০টায় কক্সবাজার যাওয়ার কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে পূর্বেক্ত গাড়িতে সামনের সিটে শাহজাদাকে উঠতে বলে পেছনের সিটে জহিরুল হক সহ বসে পড়লেন। দুপুর ২.২৫ মিনিট কক্সবাজারের হোটেল সাইমনে পৌঁছার পর নিজে গাড়িতে কিছুক্ষণ অবস্থান, অনুগামী সহযাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লে পুনরায় গাড়িতে উঠার নির্দেশ দিয়ে দৃশ্যমান ঝাউগাছের ঝোপ এবং সমুদ্রের ফেনিল জলরাশির দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে বলাকা হোটলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে, বলাকা হোটলেও গাড়ি না থামিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা। পশ্চিমধ্যে তাঁর অসুস্থতার লক্ষণ দেখে দুলাহাজারা হাসপাতালে ভর্তির সম্মতি চাইলে বলেন- ‘Go Ahead-সামনে চল’। উল্লেখ্য, এ সময়কালে তিনি সারাক্ষণ জিকিরে মশগুল ছিলেন এবং একইসাথে পথে পথে সালাম জানাচ্ছিলেন এবং সালামের জবাব দিচ্ছেন। চকরিয়া পার হওয়ার পর মাত্রাতিরিক্ত ঘাম বের হওয়া এবং নিজের হাত দিয়ে বাম পাশ চেপে ধরে ‘ইয়া আল্লাহ্ এয়া মুর্শিদ’ উচ্চারণ। এমতাবস্থায় শাহজাদা নিজের প্রয়োজনে বাবাকে আরো কিছুদিন থাকার আর্জি জানালে শুধু উপরের দিকে অঙ্গুলি-ইঙ্গিত করেন। এ সময়কালে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে দোহাজারী হাসপাতালে কিছুক্ষণের জন্য ভর্তি এবং অক্সিজেন ও ইনজেকশান প্রদান। সন্ধ্যা ৭টায় শহরের বন্দর হাসপাতালে আগমন; পুনরায় ১নং কেবিনে অবস্থান। এ সময় ডাঃ মান্নানের নেতৃত্বে চিকিৎসকদল নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দেখেন সমগ্র দেহ অচেতন-শীতল। হার্টবিট, পাল্‌স, ব্লাড প্রেসার কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও অক্সিজেন ও ইনজেকশান দেওয়া হলো। ৭-১২টা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময়কাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাবতীয়

সূত্র ও সূত্রায়নকে রীতিমতো গোলক ধাঁধায় ফেলে রাত প্রায় ১২টার সময় সুস্থ মানুষের মতো শোয়া থেকে উঠে যাবতীয় চিকিৎসা-সংযোগ শরীর থেকে খুলে ফেলার ইঙ্গিত করে এক গ্লাস পানি চেয়ে নিজ হাতেই তা পান করলেন। অতঃপর তারিখ জানতে চাইলে ১২ অক্টোবর শুনে তাঁর স্বগতোক্তি:

‘একটু পরে ঘড়িতে সময় রাত ১২টা অতিক্রম করলেই ইংরেজি ক্যালেন্ডার হয়ে যাবে ১৩ অক্টোবর। আসরের পর চাঁদের তারিখ পরিবর্তন হয়ে এখন ১ রবিউল আউয়াল। সূর্যোদয় থেকে বাংলা সনের ২৬ আশ্বিন। আপনাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে।’

এ কালাম শনার পর আলী নবী চৌধুরীর বিনীত জিজ্ঞাসা ‘এখন কী করবেন’। উত্তরে জানালেন-‘আমি আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করছি। আপনারাও আল্লাহ্ আল্লাহ্ করুন।’ অতঃপর কম্বল গায়ে দিয়ে শেষ বারের মতো শুয়ে পড়েন।

‘আপনারাও আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করুন’ অন্তিম মুহূর্তের এ কালাম-সুমধুর বাণী শুনে বন্দর হাসপাতালের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় সমবেত শত শত আশেক ভক্তের হৃদয় নিংড়ানো “আল্লাহ্ আল্লাহ্” জিকিরের ঈমানী জোশের অভাবনীয় তুঙ্গীয় বহিঃপ্রকাশের সাথে অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটে। হাসপাতালের ইবাদতখানায় ন্যূনতম ত্রিশজন আলেমের কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর ব্যঞ্জন। ইতোমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি-আল্লাহর মেহেরবাণীর নীরব ঘোষণা, সব মিলিয়ে সৃষ্টিজগতকে আন্দোলিত করে অভাবনীয় অভূতপূর্ব এক আধ্যাত্মিক ভাব-গম্ভীর পূত-পবিত্র পরিবেশে রাত ১২টা ২৭ মিনিটের সময় আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকিরের মরমী ছন্দে তিনি আল্লাহর সাথে চিরস্থায়ী মিলনে ধন্য হলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জাগতিক অবসান ঘটে ৫৯ বছর ৯ মাস ১৯ দিনের এক মহাকাব্যিক জীবনের।

১৩ অক্টোবর, বিকেলে মাত্র ৩ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে ৩টি জামাতে পাঁচ লক্ষাধিক আশেক ভক্তের অশ্রুসিক্ত উপস্থিতিতে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের ইতিহাসে স্মরণকালের বৃহত্তম নামাযে জানাযা শেষে তাঁর বহুল স্মৃতি বিজড়িত হুজরা শরিফে তাঁকে দাফন করা হয়। যেখানে বর্তমানে শোভা পাচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলার প্রতিকৃতিতে দৃষ্টিনন্দন, ইতিহাসের প্রথম স্থাপত্য শিল্প। যা কিংবদন্তির আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) চিরায়ত শাস্বত মহাত্ম্য ঘোষণা করে চলেছে অহোরাত্র-ইতিহাসের প্রবহমান ধারায়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)

● মো: গোলাম রসুল ●

হযরত আয়েশা (রা.) এর জন্ম

পূর্ব দশম হিজরী মোতাবেক ৬১২ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের কোন এক সময়ে হযরত আবু বকর (রা.) এর স্ত্রী যয়নাবের (ডাক নাম: উম্মে রোমান) গর্ভে হযরত আয়েশা (রা.) এর জন্ম হয়। কিন্তু বিখ্যাত ইতিহাসবিদ- ইবনে সায়াদ বলেছেন: নবুয়তের ৪র্থ বছর তাঁর জন্ম হয় (সূত্র: উম্মুল মোমিনীন, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মোমিন সিরাজী)। ইবন হাজার তাঁর 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তিনি নবুয়াতের পঞ্চম বছর জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ হযরতের পূর্ব নবম সনের শাওয়াল/জুলাই ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবকাল

ইমাম যাহাবী বলেন, 'হযরত আয়েশা (রা.) ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করেন।' কোরায়েশ পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁকে লালন-পালনের ভার দেওয়া হয় ওয়ায়েলের স্ত্রীর উপর। তিনি পরম যত্নে তাঁকে লালন-পালন করেন। ওয়ায়েল নিজেও খুব যত্ন করতেন এবং পরবর্তীকালে ওয়ায়েল এবং তাঁর ভাই এসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর খোঁজখবর নিতেন। তিন বছর পর তিনি (রা.) মাতা-পিতার ঘরে ফিরে আসেন। তিনি ছোটকালে খেলাধুলা ভালবাসতেন (সহিহ বোখারী, কিতাবুল তাফসীর এবং সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব) এবং দোলনায় দোল খেতে পছন্দ করতেন। তিনি আয়েশা, সিদ্দিকা, হোমায়রা, উম্মুল মোমিনীন এবং উম্মে আবদুল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

পিতা হযরত আবু বকর (রা.) এবং মাতা উম্মে রোমান উচ্চ শিক্ষিত হওয়ায় পারিবারিক পরিবেশে নারীসুলভ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন হযরত আয়েশা (রা.)। তাছাড়া মহিলা শিক্ষিকা শাফা বিনতে আবদুল্লাহ আকদিয়ার অধীনে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন। আর হযরত মোহাম্মদ (দ:) এর জীবন-সঙ্গী হওয়ার পর কোরআন-হাদিস সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির বলে সবকিছু মুখস্ত করে ফেলতেন।

শুভ বিবাহ ও সাংসারিক জীবন

রাসূল (দ.) এর সুযোগ্য সঙ্গিনী এবং স্ত্রী খাদিজাতুল কোবরার (রা.) ইত্তিকালের পর রাসূল (দ.) তাঁর কন্যাদের লালন-পালনের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। তখন তাঁর (দ.)

খালা হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা.) তাঁর নিকট পুনরায় বিয়ে করার ব্যাপারে আরজ করেন। তখন তিনি (দ.) বললেন: কাকে বিয়ে করব? উত্তরে হযরত খাওলা (রা.) বলেন: "আপনি (দ.) অনুমতি দিলে বিধবা অথবা কুমারী যে কোন পাত্রী আপনার জন্য আনতে পারব।" রাসূল (দ.) জানতে চাইলেন, পাত্রী কে? তখন হযরত খাওলা বললেন: সোকরানের বিধবা পত্নী সাওদা (রা.)কে বিয়ে করলে আপনার কন্যাদের লালন-পালন ও সাংসারিক সকল কাজ সম্পন্ন করা সহজ হবে। তারপর যথাসময়ে হযরত সাওদা (রা.) এর সংগে রাসূল (দ.) এর বিয়ে যথানিয়মে সম্পন্ন হয়। তিনি পারিবারিক কাজকর্ম ও কন্যা উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা (রা.) এর দেখাশুনা ঠিকমতই করছিলেন। কিন্তু রাসূল (দ.) এর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল না এবং তিনি কিসের যেন অভাববোধ অনুধাবন করছিলেন। এসব দেখে হযরত খাওলা (রা.) আবার হযরত আবু বকর (রা.) এর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে রাসূল (দ.) এর বিয়ের প্রস্তাব করেন। (ইবন কাসির) এখানে উল্লেখ্য, রাসূল (দ.) স্বপ্নে দেখেন যে, ফিরিশতাগণ রেশমী কাপড় জড়ানো অবস্থায় একটি জিনিস তাঁর (দ.) খেদমতে পেশ করেন। তিনি (দ.) জিজ্ঞেস করলেন: 'এটা কি?' তখন তারা বললেন: 'মহিয়সী'। রাসূল (দ.) তখন মোড়ক খুলে দেখতে পান যে, তাঁর বিয়ের প্রস্তাবিত হযরত আয়েশা (রা.)'- (সূত্র: সহিহ বোখারী)।

এরপর হযরত খাওলা (রা.) বলেন যে, আয়েশা (রা.)কে বিয়ে করলে সমাজের কুসংস্কার দূর হবে এবং আপনার মানসিক শান্তি ফিরে আসবে। তখন আরবে ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করা যায়েজ ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) যেহেতু ধর্মীয় ভাই ছিলেন, সেহেতু রাসূল (দ.) বিয়েতে রাজী হলেন।

তারপর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নবুওতের দশম সালের ২৫ শাওয়াল হিসেবে ৬২০ খৃস্টাব্দের মে মাসে পাঁচশত দিরহাম মোহর ধার্য করে [সহিহ মুসলিম, তবে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে চারশত দিরহাম] অনাড়ম্বর পরিবেশে হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে রাসূল (দ.) এর বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় ঐতিহাসিকগণের মতে তাঁর বয়স কেউ বলেছেন ছয় বছর, আবার কারো মতে সাত বছর, আবার কেউ বলেছেন নয় বছর। কিন্তু রুছমত হয়েছিল ১৪ বছর বয়সে (সূত্র: সহিহ বোখারী)।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদিসে আছে, তিনি বলেছেন, ‘আমার বিবাহ ও পতিগৃহে গমন শাওয়াল মাসে হয়েছে, আমার অপেক্ষা সৌভাগ্যশালিনী কে আছে?’-(সুনানে নাসায়ী, ৩২৩৬, ৩৩৭৭)

রাসূল (দ.) রুছমতের পূর্বেই হযরত আয়েশা (রা.) এর দেন-মোহর পরিশোধ করে দেন। কিন্তু আমাদের সমাজে অধিক মোহর ধার্য করার প্রবণতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে এবং স্ত্রীর হক পরিশোধের কোন খেয়াল মাত্র নেই। তাই সকলেরই রাসূল (দ.) এর পথ অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য ও কর্তব্য।

হযরত আয়েশা (রা.) পিতার নিকট নানাবিধ জ্ঞানার্জন ও কবিতা রচনার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। তাছাড়া সামাজিক আচার ব্যবহার, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা পিতা-মাতার কাছেই শিখেছিলেন। স্বামীগৃহে আসার পর রাসূল (দ.) এর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। আল্লাহ পাক কোরআনে ঘোষণা করেন, ‘(হে নবী পত্নীগণ!) আপনাদের ঘরে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তা আপনারা শিখে নিন। নিশ্চয়ই আল্লাহুতায়াল্লা সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল’-(সূরা আহযাব: ৩৪)। তাই তিনি সময় পেলেই রাসূল (দ.) এর নিকট জিজ্ঞেস করে জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে যাচ্ছিলেন। তিনি দিবা-রাত্রে কমপক্ষে শরীয়ত ও মারিফাতের ২০টি (বিশটি) মাসয়ালা মসজিদে নববীর আলোচনা হতে আয়ত্ত করতেন। নবীগৃহে আসার পর অভাব-অনটনের মাঝেও তিনি সকল কাজ নিজ হাতে সমাধা করতেন এবং অনেক সময় তাঁদের ঘরে চুলা জ্বলত না। কোন কোন সময় আত্মীয়-স্বজনের কাছ হতে খাদ্য-সামগ্রী হাদিয়া স্বরূপ এলেও তা গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তাই বলে স্বামীর সোহাগ তাঁর কাছে অমূল্য সম্পদ হিসেবেই ছিল এবং তিনিও স্বামীর সকল কাজে সহায়তাকারী হিসেবে গণ্য হতেন। নবী করিম (দ.) তাঁর মহিয়সীগণকে কিরূপ ভালবাসতেন তার প্রমাণ নিম্নরূপ: ‘তিনি (দ.) সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে স্বীয় স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি স্ত্রীদের নিকট তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম’- (মিশকাত, পৃ. ২৮১)।

রাসূল (দ.) এর পরিবারে খুবই অভাব ছিল। তাই আল্লাহুতায়াল্লা পক্ষ হতে অধিকারের আয়াত নাযিল হয়। মহান আল্লাহ বলেন: হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো আমি তোমাদের ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় করে দেই। পক্ষান্তরে যদি

তোমরা আল্লাহ তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে সৎকর্ম পরায়ণদের জন্য আল্লাহুতায়াল্লা মহা পুরস্কার প্রস্তাব করে রেখেছেন।’-(সূরা আহযাব: ২৮-২৯) উক্ত অধিকারের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (দ.) তাঁর বিবিদের সামনে তার বিষয়বস্তু প্রকাশ ও প্রচার করেন এবং বলেন যে, ‘এটা শনার পর উত্তরটা তাড়াছড়া করে দিবে না; বরং তোমাদের পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের পর দেবে। এ আয়াত শোনার সাথে সাথে হযরত আয়েশা (রা.) আরজ করলেন, “এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পূণ্যবতী স্ত্রীগণকে কোরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলে আমার মত সবাই একই মত ব্যক্ত করেছিলেন।” হযরত রাসূল (দ.) এর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবেলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য কেউ গ্রহণ করলেন না। হযরত আয়েশা (রা.) এর নিকট প্রিয় স্বামীর অভাব-অনটন একেবারেই তুচ্ছ ব্যাপার ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) স্বামীর সাথে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁকে অভিভূত করে রেখেছিলেন। তার সাথে আল্লাহর আদেশ পালনে, সমাজের উপকারে মজলুমের আর্তনাদে আপন প্রাণ বিনা দ্বিধায় বিলিয়ে দিয়ে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তা আর কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়।

অবাস্তর অপবাদ খণ্ডন

পঞ্চম হিজরী সনের ২রা শাবান নজদের বনী মোস্তালেক গোত্রের সংগে মুসলিমদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল (দ.) এর সাথে ছিলেন।

যুদ্ধ শেষে মুজাহিদ বাহিনীসহ রাসূল (দ.) মদীনায়ে ফেরার পথে হেই শাবান একস্থানে রাত্রি যাপন করার জন্য তাঁর স্থাপন করেন। প্রত্যুষে কাফেলা পুনরায় রওনা হয়ে যায়। ঐ সময় হযরত আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে অদূরে একটি নির্জন স্থানে যান। তারপর তাঁবুর দিকে ফেরত আসার সময় দেখলেন তার বোনের দেওয়া সোনার হারটি তাঁর গলায় নেই। তিনি তখন তার তালাশে আবার সেখানে গেলেন। কিন্তু হার না পেয়ে তিনি আবার কাফেলার কাছে এসে দেখলেন কাফেলা রাসূল (দ.) সহ চলে গিয়েছে। তিনি ভাবলেন ঐখানে থাকাই শ্রেয় যাতে রাসূল (দ.) খবর পেয়ে তাঁকে নিতে আসবেন। তিনি চাদর গায়ে দিয়ে গভীর চিন্তায় সেখানেই বসে রইলেন। তখনকার রীতি অনুযায়ী সাফওয়ান ইবনে মুআত্তিল (রা.) কাফেলার সমস্ত কিছু খুঁজে দেখার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সকালের আলো ফোটার সময় সাফওয়ান (রা.) দেখলেন দূরে

অস্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে। তখন তিনি দ্রুত সেখানে এসে দেখলেন হযরত আয়েশা (রা.) বসে আছেন। তখন তিনি বললেন: 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' হযরত আয়েশা (রা.) চোখ খুলে দেখলেন সাফওয়ান (রা.) কাফেলারই লোক। তখন হযরত সাফওয়ান (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) কে উটের পিঠে বসতে বললেন এবং তিনি নিজে লাগাম ধরে কাফেলার পরবর্তী মনজিলে দ্রুতগতিতে উট চালনা করে হাজির হয়ে রাসূল (দ.) এর কাফেলার সাথে মিলিত হলেন। এবার সুযোগ পেয়ে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মিথ্যা দুর্নামি রটালো যে, হযরত আয়েশা (রা.) অপবিত্র হয়েছেন। অপবাদের গুঞ্জন শুনে রাসূল (দ.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবে মিথ্যা অপবাদকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তখন মহান আল্লাহ্‌তায়ালাই ঐ আয়াত নাযিল করে দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন। মহান আল্লাহ্‌ বলেন: 'যারা এ (নবী পরিবার সম্পর্কে) মিথ্যা অপবাদ নিয়ে এসেছে, তারা তো (ছিলো) তোমাদের একটি (ক্ষুদ্র) দল; (কিন্তু এই অপবাদে যাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে) তারা যেন নিজেদের জন্যে বিষয়টিকে ক্ষতিকর মনে না করে। বরং এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। এদের মধ্যে (অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে) প্রতিটি ব্যক্তি যে যতটুকু গুনাহ করেছে সে ততটুকুই (তার ফল) পাবে, আর তাদের মধ্যে যে সবচাইতে বেশী (এ কাজ) অংশগ্রহণ করেছে, তার জন্যে আযাবও রয়েছে অনেক বড়ো'-(সূরা আন নূর: ১১)।

মহান আল্লাহ্‌ আরো বলেন: 'যদি এ (মিথ্যা ঘটনাটি) শোনার পর মোমিন পুরুষ ও মোমিন নারীরা নিজেদের ব্যাপারে একটা ভাল ধারণা পোষণ করত; কত ভাল হতো যদি (তারা একথা) বলতো, এটা হচ্ছে এক নির্জলা অপবাদ মাত্র'-(সূরা আন নূর: ১২)। [এ ক্ষেত্রে সূরা আন নূর এর আয়াত ১৩-২০ এবং ২৩-এ দ্রষ্টব্য]

যা হোক অপবাদকারীদের মিথ্যা অপবাদের কারণে শরিয়ত-নির্ধারিত শাস্তি দেয়া হয়। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হয়। মোমিনগণ তওবা করেন। তখন থেকে হযরত আয়েশা (রা.) 'সিদ্দিকা' নামে ভূষিত হন।

তাইয়ান্মুমে'র বিধান

মহানবী (দ.) জাতুল জায়েশের যুদ্ধ হতে ফিরে আসছিলেন। এবারও হযরত আয়েশা (রা.) নবী (দ.) এর সাথে ছিলেন। তাঁর বোনের হার তাঁর গলায় দিয়েছিলেন। ফিরতি পথে একস্থানে এসে হারটি পাওয়া যাচ্ছিল না এবং তিনি তা রাসূল

(দ.)কে জানালেন। এ কথা শুনে নবী (দ.) যাত্রাভঙ্গ করে কাফেলা নিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই ফযরের নামাযের সময় সৈন্যদের মাঝে চঞ্চলতা দেখা দিল এবং সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

কিন্তু আল্লাহ্‌র অসীম মহিমা। মহান আল্লাহ্‌ জিবরাঈল (আ.) এর মারফত নবী করিম (দ.) এর নিকট অহি পাঠালেন এবং বললেন, 'যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা বিদেশে থাক কিংবা তোমরা কেউ শৌচাগার হতে আস, কিংবা স্ত্রী সঙ্গম কর' তখন পানি পাওয়া না গেলে, পবিত্র মাটি দ্বারা তাইয়ান্মুম কর। হাত ও মুখমণ্ডল মাসেহ কর। আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী'-(সূরা নিসা: ৪৩)।

শেষ জীবন

জঙ্গ জামালের করুণ পরিণতি হযরত আয়েশা (রা.) কে বিচলিত করে এবং তারপর তিনি বসরা হতে হজ্জ পালন করার লক্ষ্যে মক্কা গমন করেন। হজ্জপর্ব শেষ করে তিনি মদীনায ফিরে আসেন। জ্ঞান সাধক হিসেবে বাকী জীবন কাটান। তিনি চারশতের বেশী ছাত্র-ছাত্রীকে কোরআন-হাদিস শিখান বলে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন। মানবীয় চরিত্রের সকল গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। কোরআন-হাদিসের সুন্দর-সুসংহত ব্যাখ্যাই তিনি মুসলিম সমাজের জন্য দিয়ে গেছেন। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। হযরত আয়েশা (রা.) এর বিছানায় থাকাকালিন রাসূল (দ.) এর নিকট অহি নাযিল হতো। কিন্তু অন্যকোন স্ত্রীর বিছানায় থাকাকালিন তা হয় নি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব এবং শ্রেষ্ঠ নবী (দ.) হযরত আয়েশার ক্রোড়ে মাথা রেখে এ জগত থেকে পর্দা করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (দ.)'র সাথে নয় বছর সংসার করেন। ফলে তিনি অধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করতে সক্ষম হন। রাসূলুল্লাহ (দ.)'র জাহেরী পর্দা করার পর তিনি আরো প্রায় ৪৮ বছর দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি এই সব হাদিস অন্যদের শিক্ষা দিয়ে সময় অতিবাহিত করেন।

ইমাম যুহরী বলেন, যদি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর সাথে উম্মাহাতুল মোমিনীন এবং অন্যান্য সমস্ত মহিলাদের তুলনা করা হয় তবে হযরত আয়েশা (রা.) এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিপন্ন হবে। তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে তিবরানীর বর্ণনা হলো, হযরত আয়েশা (রা.) এর বক্তৃতা এমন বিশুদ্ধ ও প্রাজ্ঞ ছিল যে, কোন বক্তা তাঁর থেকে অধিক বিশুদ্ধ এবং প্রাজ্ঞ ভাষায় বক্তৃতা করতে সক্ষম হতেন না।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী তাঁর 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে উল্লেখ

করেন: হযরত আয়েশা (রা.) বড় ফিকাহবিদ সাহাবী ছিলেন। রাসূল (দ.) হতে যে ছয়জন সাহাবী সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি মোট ২২১০টি [কারো মতে ২৪১০টি] হাদিস বর্ণনা করেছেন। এরমধ্যে ১৭৪টি হাদিস ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। একক ভাবে ইমাম বোখারী (র.) ৫৪টি এবং ইমাম মুসলিম (র.) ৫৮টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তাই তিনি সময় পেলেই রাসূল (দ.) এর নিকট জিজ্ঞেস করে জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে যাচ্ছিলেন। তিনি দিবা-রাত্রে কমপক্ষে শরীয়ত ও মারিফাতের ২০টি (বিশটি) মাসয়ালা মসজিদে নববীর আলোচনা হতে আয়ত্ত করতেন। নবীগৃহে আসার পর অভাব-অনটনের মাঝেও তিনি সকল কাজ নিজ হাতে সমাধা করতেন এবং অনেক সময় তাঁদের ঘরে চুলা জ্বলত না। কোন কোন সময় আত্মীয়-স্বজনের কাছ হতে খাদ্য-সামগ্রী হাদিয়া স্বরূপ এলেও তা গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

কারো মতে, আহকামে শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ হাদিস হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী শরিফে বর্ণিত আছে, সাহাবীদের কাছে কোন কঠিন সমস্যা দেখা দিলে হযরত আয়েশা (রা.) তার সমাধান দিতেন। হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমানের (রা.) আমলে তিনি ফতোয়া দিতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এর ইত্তিকাল

হযরত আয়েশা (রা.) এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। হিজরী ৫৮ সনের পবিত্র রমজান মাসের ১৭ তারিখ মোতাবেক ১৩ জুন ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের দিবাগত রাতে এশা নামাযের পর তিনি তারাবীহ নামায সমাধা করলেন এবং বিছানায় শায়িত হবার কিছুক্ষণ পরেই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন। তখন তাঁর বয়স ৬৬ বছর ছিল। তখন মদিনার গভর্নর ছিলেন হযরত আবু হুরাইরা (রা.)। তাই তিনি তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। মদিনার জান্নাতুল বাকীতে তাঁর মাযার জিয়ারত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ১৯৯৬ সালে।

সুফি উদ্ধৃতি

- সংসারত্যাগী হওয়া এবং নেক কাজে মনোনিবেশ করা আল্লাহুতা'য়ালার রহমতের বায়ু স্বরূপ, যা তোমাদের প্রতি প্রবাহিত হচ্ছে।
- মুসলমান ভাইকে অপমান ও অপদস্থ করলে তোমাদের যত ক্ষতি হবে, রাশি রাশি পাপ তোমাদের তত ক্ষতি করবে না।
- দুনিয়া দুনিয়াদারদের উপর ধোঁকার উপর ধোঁকা, আর আখিরাত আখিরাতওয়ালাদের উপর আনন্দের উপর আনন্দ। আর আল্লাহুতা'য়ালার মা'রিফাত মা'রিফাতওয়ালাদের নূরের উপর নূর।
- প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসকে আল্লাহর ধ্যানে নিয়োজিত রাখাই মা'রিফাত ওয়ালাদের এবাদত।
- আল্লাহুতা'য়ালাকে চিনতে পারার লক্ষণ হলো, জনসমাজ হতে সরে থাকা এবং নির্জনে বসে আল্লাহুতা'য়ালার মা'রিফাতের মধ্যে ডুবে থাকা।
- কারো হৃদয়ে আল্লাহুতা'য়ালার ভালবাসা সৃষ্টি হলে, তা তাঁর হৃদয় হতে আল্লাহুতা'য়ালার ব্যতীত অন্য সব কিছুকে বের করে দেয়। অন্য কোন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না এবং শেষ পর্যন্ত তিনি একাকী হয়ে যান, যেমন আল্লাহুতা'য়ালার একক।
- আল্লাহুতা'য়ালার সত্যিকারের পরিচয় পেলে আল্লাহুতা'য়ালার প্রেম-ভালবাসায় মত্ত না হয়ে উপায় থাকে না। ভালবাসা ব্যতীত মা'রিফাতের কোন মূল্য হয় না।

--- হযরত বায়জীদ বোস্তামী (রহ.)

নবী-রাসূলের জীবন প্রবাহে তাসাওউফ ধারা

● অধ্যাপক জহুর-উল-আলম ●

মধ্যপ্রাচ্যে মহানবী (দ.)-কে দেখা হয় একজন মানুষ হিসেবে। তাঁর মধ্যে যে অসীম আধ্যাত্মিক শক্তি এবং প্রেমধারা বিদ্যমান - তার সমর্থন মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় বিশারদদের চিন্তা এবং লিখায় তেমন প্রতিফলিত হয় না। তাঁরা ‘মানুষ মুহাম্মদকে (দ.)’ প্রকাশ করতে অতি তৎপর। এটি মহানবী (দ.) সম্পর্কে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ। পবিত্র কুরআনে মহানবী (দ.) সম্পর্কে উল্লেখ আছে, “কুল ইন্না মা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া”- অর্থাৎ, বলুন (হে মুহাম্মদ), নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষ, যার উপর অহি নাযিল হয়েছে- (সূরা হা-মিম সিজদাহ:৪১:৬)। পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে, “হে নবী! বলুন আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমি ওহী পেয়েছি যে, আল্লাহ তোমাদের একমাত্র উপাস্য। অতএব (মহান বিচার দিবসে) যে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকে শরিক না করে”- (সূরা কাহাফ:১৮:১১০)। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, “হে মানুষ! রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের (রব) কাছ থেকে তোমাদের জন্য সত্য বিধান এনেছে। অতএব তা বিশ্বাস করো। এতেই তোমাদের কল্যাণ। আর তোমরা এ সত্য অস্বীকার করলেও মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই থাকবে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়”-(সূরা নিসা:৪:১৭০)। মধ্যপ্রাচ্যে এ সকল আয়াতের প্রথম অংশ সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অংশ ওহী সম্পর্কে সমর্থন থাকলেও ওহীর মর্যাদা, অত্যাৱশ্যকীয়তা এবং উৎস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয় না। অথচ ‘ওহী’র কারণে মানব আকৃতিধারী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর সঙ্গে অন্য মানুষের মানবিক গুণগত মর্যাদা এবং পার্থক্য স্পষ্ট করা আছে। অর্থাৎ এ ধরনের মর্যাদার কারণে তিনি মানব জাতির আনুগত্যের অনন্য কেন্দ্রবিন্দু এবং অনুসরণযোগ্য সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে স্থাপিত আছেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্ম ব্যর্থ করো না’-(সূরা মুহাম্মদ:৪৭:৩৩)। ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ মাত্র অবহিত আছেন যে, ওহী তথা প্রত্যাদেশ শুধুমাত্র নবী-রাসূলদের নিকট নাজিল হয়। ওহী অদৃশ্য জগতের বার্তা। ওহীর উৎস অদৃশ্য

মহাশক্তি সম্পর্কে নবী-রাসূলগণ অবহিত আছেন। নবী-রাসূলগণের সঙ্গে অদৃশ্য মহামহিম শ্বাসত-চিরন্তন শক্তির (আল্লাহর) সংযোগ সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে ওহী। ওহী মানব দেহের উপর নয়, রুহের উপর নাজিল হয়। রুহের সঙ্গে রুহের মালিকের এ সংযোগ সম্পর্কের বিষয়টি নিতান্ত গোপনীয় এবং নিভূতে একান্ত কথোপকথনের মতো। রুহের মালিক আল্লাহ মানব চক্ষে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ স্বয়ং রুহকে ‘তাঁর আদেশ’ ঘোষণা দিয়ে এ সম্পর্কিত ধারণাকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। মানুষ সহ প্রত্যেক সৃষ্টি জীবের রুহ রয়েছে। আল্লাহ তাঁর সুনির্দিষ্ট কতিপয় বান্দার রুহের উপর ওহী নাজিল করেন। এ ধরনের পবিত্র রুহ যাঁরা ধারণ করেন তাঁরা নবী-রাসূল এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এ ধরনের পবিত্র রুহ যে মানবের দেহপিঞ্জরে অবস্থান করে সেই মানুষের সঙ্গে অন্যদের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মহান স্রষ্টা আল্লাহ যে রুহের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন সে রুহ থেকে ব্যক্ত বিষয়াদি সাধারণ কোন মানুষের নয়- বরং স্বয়ং আল্লাহর। তাই তাঁদের বক্তব্য পরম জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং পবিত্র। তাঁরাই নবী-রাসূলের সুমহান মর্যাদা প্রাপ্ত। মানব আকৃতিধারী হওয়া সত্ত্বেও তাই তাঁদের সাথে অন্য মানবের সুস্পষ্ট পার্থক্য সর্বত্র স্বীকৃত ও দৃশ্যমান বিষয়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ঘোষণা দিয়েছে, “এ জন্যই আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল মনোনীত করে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, যিনি আমার সত্যবাণী তোমাদের শোনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে, কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। আর তোমাদের সেই সত্যসমূহ জানায়, যা তোমরা জানতে না”-(সূরা বাকারা:২:১৫১)।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহের গবেষক-চিন্তাবিদরা, ইহজাগতিকতার আলোকে নবী জীবন চিত্রিত করে থাকেন। তাঁরা নবীর (দ.) বাহ্যিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক জীবনের নানা অববাহিকার উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সন্দর্ভ করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি নবী জীবন সম্পর্কে একটি তাৎপর্যময় আলোচনা এবং বিশ্লেষণ। তবে যে মহান হৃদয়ে অন্তর্যামী অবস্থান করে নবী জীবনকে পবিত্র কল্যাণকর ধারায় প্রবাহিত করেছেন সে সম্পর্কে বর্ণনার সীমাবদ্ধতার কারণে নবুয়ত-রিসালত বিষয়টি এখানে অস্পষ্ট। পবিত্র কুরআনে অন্তর তথা হৃদয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ ঘোষণা করেন, “(হে নবী) আমি কি আপনার অন্তর প্রসারিত করে দেই নি?”- (সূরা ইনশিরাহ:৯৪:১)। অনন্ত অসীম অন্তর সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানবী (দ.) এর পবিত্র বক্ষ উন্মিলনের ঘটনা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ সকল মানুষের নবী হিসেবে নিজেকে সুদৃঢ় অবস্থানে দীপ্ত ও দৃঢ় রাখার লক্ষ্যে শৈশবেই মহানবীর জীবনে ঐশী ইচ্ছা জনিত বক্ষ প্রসারণের ঘটনা সংঘটিত হয় এবং তাঁর হৃদয়কে ঐশী পবিত্রতা ও শ্লিষ্টতায় ‘সীল’ করা হয়। পৃথিবীতে আল্লাহর ফেরেসতা কর্তৃক অন্যকোন মানবের উপর এ ধরনের ঘটনার ইতিহাস নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর জীবন প্রবাহের এ দিকটি অনালোচিত হলে নবুয়ত সম্পর্কিত বিষয়টি স্পষ্ট হয় না। মধ্যপ্রাচ্যে নবী জীবনের এ বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণভাবে বিশ্লেষণে না আসায় ইসলাম ধর্মের মর্মশক্তি সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের বিভাজন আছে। এরকম বিভাজনের কারণে তাসাওউফ তথা সুফিবাদ সম্পর্কে নানামুখি নেতিবাচক আলোচনা ও বিশ্লেষণ মুসলিম জনসমাজে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ তাসাওউফ মহানবী (দ.) এর সময় থেকে সাহাবা-ই কিরামের জীবনে অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে অনুসৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় প্রত্যেক নবী মানব সমাজে বসবাস করেছেন। মানুষের সঙ্গে তাঁরা লেনদেন, কাজ-কারবার করেছেন। তাঁদের প্রায় সকলের পরিবার-পরিজন, ঘর-সংসার ছিল। ব্যতিক্রম ব্যতীত কেউই সংসার বিমুখ জীবন যাপন করেন নি। মানব আকৃতিধারী হলেও তাঁরা ছিলেন ওহী প্রাপ্ত। জন সমাজে অবস্থান করে তাঁরা মানুষের নিকটই ওহী প্রচার করেছেন। ওহী প্রাপ্তির কারণে নবীর অবস্থান অন্যান্য মানুষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই তাঁদেরকে শুধু মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করলে নবীর পদ-মর্যাদার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। নবীর পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে ইসলাম ধর্মের আলোচনা ও বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ রাখলে ওহীর উৎস এবং সংযোগস্থল সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা যায় না। কারণ ওহীর সংযোগ স্থল হচ্ছে ‘রূহ’। আর রূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হবার প্রক্রিয়া হলো ‘তাসাওউফ’। মানবাত্মার স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতা অর্জনের দিক নির্দেশনা সম্পর্কিত কর্মময়তাকে বলা হয় তাসাওউফ জীবন। তাসাওউফ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট না হলে নবুয়ত সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ সম্ভব হয় না। তাই কারো কারো ধারণা ওহী প্রচার সমাপ্তির পর নবীর আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তারা বিশ্বাস করেন ওহী তথা ‘কুরআন’ থেকে তালিম গ্রহণ করলে চলবে, নবীর অনুকরণ ও অনুশীলনের

তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তারা ওহীর প্রধান উৎস এবং অবস্থান সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধানে অনীহ থাকেন এবং তাসাওউফ সম্পর্কে এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যজগত এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ গবেষণাকর্ম প্রধানত পার্থিব জীবনবাদ নির্ভর। পাশ্চাত্যে ধর্ম এবং পার্থিব জীবনের সংজ্ঞা আলাদাভাবে বর্ণিত হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যে ধর্ম হচ্ছে গীর্জা-মন্দির কেন্দ্রিক জীবন- যা অনেকাংশে বৈরাগ্যবাদ সমর্থিত। অর্থাৎ ধর্ম সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় আর জাগতিক কর্ম স্বতন্ত্র বিষয়। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ধর্ম হচ্ছে পার্থিব জীবনের আচার আচরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে পার্থিব জীবনের আচার-আচরণ যে মানসিক সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হয় এসম্পর্কে মনের ‘ইচ্ছা শক্তি’র ভূমিকা নিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনে তেমন কোন বর্ণনা থাকে না। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমানে চলমান চিন্তাধারা কিছুটা হলেও পাশ্চাত্য বৈষায়িকবাদের অনুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল কুরআনের তথ্য অনুযায়ী মানুষের ইচ্ছা শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ‘রূহ’। ‘রূহ’ নিঃসন্দেহে পবিত্রতম ‘ইলাহের’ নির্দেশ। এ কারণে ‘রূহ’ প্রাপ্ত প্রতিটি শিশুর ভূমিষ্ঠকালীন সময়কে পবিত্র কুরআন ‘ফিত্বরত’ ঘোষণা করেছে। তবে পৃথিবীতে আগমনের পর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় রাষ্ট্রীয় পরিবেশের প্রভাব শিশু-কিশোর-তরুণ সকলকে ভিন্ন ভিন্ন আচার-সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসের মাত্রিকতায় গড়ে তুলে। এর ফলে মানুষের আচার-আচরণে ভাল এবং খারাপ উভয়বিধ ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। মানুষের ইচ্ছাশক্তিতে নৈতিকতা-অনৈতিকতার প্রবল প্রতাপের দ্বন্দ্ব সমাজকে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ স্বার্থান্বেষিতায় কলুষিত করে তুলে। ধর্মের নৈতিক শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় ইবলিশী ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে অনমনীয় অবস্থানে দৃঢ় থাকা। ধর্মের এ ধরনের সূক্ষ্ম নির্দেশনাটি বাহ্যিক আচরণ থেকে নিঃসন্দেহে ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষের ইচ্ছাশক্তির গুণ্ডিত অর্জনের নির্দেশনা বিষয়ে লোক চক্ষুর আড়ালে ইবাদত, রিয়াজত এবং নিঃস্বার্থভাবে মানব কল্যাণ সাধনে ভূমিকা রেখে মানব অন্তরকে পবিত্র ও সুগন্ধিময় করার লক্ষ্যে তাসাওউফ তথা সুফিপন্থা হচ্ছে আল্লাহর পছন্দনীয় নির্ধারিত ফলিত ক্ষেত্র। এটি নতুনভাবে উদ্ভাবিত কোন পন্থা নয়। বরং প্রথম মানব এবং নবী হযরত আদম (আ.) থেকে প্রচলিত সত্যিকার মানব জীবনাচার সম্পর্কিত পথ নির্দেশিকা।

আমাদের সমাজের একটি অংশ বিশেষ করে ইংরেজী

শিক্ষিতরা আরবি ভাষা-সাহিত্য-পবিত্র কুরআন এবং হাদিস সম্পর্কে জ্ঞাত হবার জন্যে ধারণা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আরবি ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন আলেম-ওলামাদের বক্তব্য এবং মন্তব্যের উপর নির্ভরশীল। আরবি ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন আলেমদের একটি বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক ধর্ম সাহিত্যের আলোকে ধর্মীয় নিয়ম কানুনের ফয়সালা দিয়ে থাকেন। ‘তাসাওউফ’ যেহেতু সিলেবাস ভিত্তিক একাডেমিক বা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় নয়, তাই এ বিষয়টি ফিকাহ, কিয়াস, ইজমা, ইজতিহাদ সম্পর্কিত কারিকুলামের মতো সূচীপত্র আকারে আসে না। তাসাওউফ সম্পর্কিত গ্রন্থাদিও শিক্ষা পদ্ধতির কারণে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয় না। ফলে অনেক আলেম-ওলামা তাসাওউফ বিষয়কে প্রকাশ্যে কোন আলোচনায় আনেন না। এ কারণে সুফিবাদ তথা তাসাওউফ সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে তেমন কোন ধারণা থাকে না। বরং তাসাওউফ সাধকদের বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে সুফি-দরবেশ-আউলিয়াদের সাহচর্যে গলে মানুষ অর্থ-বিস্ত-সহায়-সম্বল-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনে সক্ষম হয়ে থাকেন। এ কারণে বেশিরভাগ মানুষ সুফি-দরবেশ-পীর আউলিয়ার দরবারে, খানকায় গমনাগমন করে থাকেন। সাধারণ মানুষের এ পর্যায়ের বিশ্বাস তাসাওউফ সম্পর্কিত ধারণার অপূর্ণাঙ্গ অংশ। তবে তাসাওউফের প্রধান দিকটি হচ্ছে আত্মার পরিপূর্ণতা অর্জনমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, যার মাধ্যমে তাসাওউফ চরিত্র অর্জন, মানুষ অন্ততঃপক্ষে মোমিন-মোত্তাকী রূপে সমাজে বসবাস করতে সক্ষম হয়। মোমিন-মোত্তাকীরা হলেন মানব সমাজের অক্ষতিকর মানুষ-যাঁরা সৃষ্টির কল্যাণ ব্যতীত কখনো অকল্যাণমূলক কাজ করেন না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মতো তাসাওউফ পন্থায় প্রকাশ্যে কোন সনদের ব্যবস্থা নেই। তবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর রাজ্য শাসন ও পরিচালনা ব্যবস্থায় সুকঠিন রিয়াজতে নিমগ্ন তাসাওউফ সাধকরা পদ পদবী অনুযায়ী অলৌকিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। আল্লাহর এ ধরনের অনুশাসনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল। সাধারণত গাউস, কুতুব, আবদাল, কলন্দর, মজজুবরা এ ধরনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে আল্লাহর ঐশী নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁরা এলাকা ভেদে বিশ্বজুড়ে অলৌকিক ভাবে অনেক কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন। এরাই হলেন তাসাওউফ পন্থী সাধক ব্যক্তিত্ব। তাসাওউফ হচ্ছে রূহ জাগতিক বিষয়। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী

(আস্তিক-নাস্তিক) সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, মানব দেহের শক্তিকেন্দ্র হচ্ছে ‘রূহ’। রূহ ব্যতীত মানবদেহ জড় পদার্থ তথা মৃতদেহ। তাই মানব বিষয়ে আলোচনায় ‘রূহ’ এর বিষয়টি মূল ও মৌলিক হিসেবে পরিগণিত। ‘রূহ’ ব্যতীত সবকিছুই উচ্ছিষ্ট-আবর্জনা এবং লয়প্রাপ্ত বিষয়। তাসাওউফ ‘রূহ’ সম্পর্কে মানুষকে ধারণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পর্কিত আক্ষরিক বিদ্যা। মানব সৃষ্টি সম্পর্কিত মৌলিক বর্ণনায় (পবিত্র কুরআন সহ ধর্মগ্রন্থ সমূহে) দেখা যায় আল্লাহ নিজেই আদমের মাটির দেহে ‘রূহ’ ফুঁকে দিয়েছেন। ‘রূহ’ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, “ওরা আপনাকে ‘রূহ’ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। ওদের বলুন, ‘রূহ’ হচ্ছে আল্লাহর হুকুমজাত। এ ব্যাপারে তোমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত”-(সূরা বনি ইসরাঈল:১৭:৮৫)। ‘রূহ’ মানুষের ধারণাতীত বিষয়। মানুষের স্বাভাবিক বোধ শক্তি এবং শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে রূহের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। রূহ আদমের দেহে প্রবেশিত হলে আদম আকৃতি সক্রিয় হয়ে যায়। তখন আদমকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দেন। মাটি দিয়ে তৈরী ‘আদম’ এর দেহ আকৃতিতে ‘রূহ’ প্রবেশিত না করা পর্যন্ত আদমকে সিজদা করার নির্দেশ আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে দেন নি। এখানে বর্ণনাতীত ভাবে লুকায়িত আছে ‘রূহ’ এর রহস্য এবং হিকমত। ফিরিশতা সর্দার আজাজিল স্বীয় সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অহংকার প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে আদমকে সিজদা প্রদান করা থেকে বিরত থাকে। নিজের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অহংকার প্রদর্শন করায় আজাজিল ফিরিশতা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়। আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত ‘ইবলিস’ চিহ্নিত করে ফিরিশতা জগৎ থেকে বহিষ্কার করে দেন এবং জাহান্নামে নিপতিত হবার সংবাদ জানিয়ে দেন। আল্লাহর ক্রোধ লক্ষ্য করে ইবলিস কোন প্রকার অনুশোচনা-অনুতাপ এবং ক্ষমা ভিক্ষা না করে নিজের অহংকারকে অক্ষুণ্ন রেখে কিয়ামতের পূর্ব সময় পর্যন্ত আল্লাহর নিকট ‘অবকাশ’ চায়। ইবলিস সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, “আল্লাহ বলেন, তুমি (ফিরিশতার কাতার থেকে) বের হয়ে যাও। আজ থেকে তুমি বিতাড়িত। মহান বিচার দিবস পর্যন্ত তুমি লানতগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে। ইবলিস বলল, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে সুযোগ দিন। আল্লাহ বললেন, সে দিবস পর্যন্ত তোমাকে সুযোগ দেয়া হলো, যে দিবসের আগমনকাল শুধু আমিই জানি”-(সূরা হিজর:১৫:৩৪-৩৮)। হযরত আদম (আ.)কে সিজদা না করা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ

আছে, “আল্লাহ্ যখন ইবলিসকে জিজ্ঞেস করলেন, আদেশ দেয়ার পরও তুমি সিজদা করলে না কেন? কে তোমাকে বাধা দিল? সে (ইবলিস) বলল, আমি আদম অপেক্ষা উত্তম। আমাকে আপনি আঙন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর ওকে (আদমকে) বানিয়েছেন কাদা দিয়ে। আল্লাহ্ বললেন, “তুমি নেমে যাও। এখানে থেকে ‘অহংকার’ করবে তা হতে পারে না। তাই এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি অধমেরও অধম। ইবলিস আবেদন করল, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেন, (ঠিক আছে) ‘তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো’। এরপর ইবলিস বলল, আপনিই যাদের উপলক্ষ্য করে আমাকে চরম শাস্তি দিলেন, তাদের আপনার সরল পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে আমি ওঁৎ পেতে থাকব, এ আমার প্রতিজ্ঞা। সামনে-পেছনে-ডানে-বামে অর্থাৎ সম্ভাব্য সকল দিক দিয়ে এবং সকল উপায়ে আমি তাদের বিভ্রান্ত করব এবং আপনি তাদের অধিকাংশকেই অকৃতজ্ঞ হিসেবে পাবেন। তখন আল্লাহ্ বললেন, লাঞ্চিত ও ধিকৃত অবস্থায় এখান থেকে বের হয়ে যাও। আর মানুষের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে, তাদেরকে ও তোমাকে দিয়েই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব”-(সূরা আরাফ:৭:১২-১৮)। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে আরো উল্লেখ আছে, “স্মরণ করো, যখন ফিরিশতাদেরকে বললাম, ‘আদমকে সিজদা করো; তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে বলেছিল, ‘আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি কর্দম হতে সৃষ্টি করেছেন? সে বলেছিল, আপনি কি ‘বিবেচনা’ করেছেন, আপনি আমার উপর এ ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করলেন কিয়ামতের দিন পর্যন্ত, যদি আমাকে অবকাশ দেন তা হলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরগণকে (আদম সন্তানদের) অবশ্যই কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব।’ আল্লাহ্ বললেন, যাও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তবে জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি, পূর্ণ শাস্তি। তোমার আহবানে এদের মধ্যে যাকে পারো পদস্থলিত করো তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা ওদেরকে আক্রমণ করো এবং ওদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরিক হয়ে যাও এবং ওদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও’ শয়তান ওদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র, নিশ্চই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট”-(সূরা বনি ইসরাঈল:১৭:৬১-৬৫)।

উপর্যুক্ত আয়াত অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে; আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রদানের পরেও ‘আজাজিল’ আদমকে সিজদা না করায় তা

আদেশ লংঘনকারী, অহংকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়। আল্লাহ্‌র ব্যতীত কোন সৃষ্টির অহংকার করা হারাম তথা অবৈধ। অহংকার দেমাগ মুতাকাবিবরী আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। আর সৃষ্টির জন্যে এ গুলো হচ্ছে অমার্জনীয় অপরাধ। সিজদা হলো আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্যের পরম নিদর্শন- যা মানুষের চির উন্নত শির তথা মস্তক নমিত করে মাটিতে কপাল লাগিয়ে প্রদর্শন করতে হয়। একমাত্র সিজদাতে অহংকার দেমাগ প্রভৃতির লয় ঘটে থাকে। সিজদাই বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রমাণ করে যে, কোন সৃষ্টিরই আল্লাহ্‌র সম্মুখে অহংকার করার মতো কিছুই নেই। অর্থাৎ অহংকার ইবলিসের খাসলত। মানুষের মধ্যে অহংকারী ব্যক্তি মাত্রই অবাদ্য ইবলিসের অনুগামী।

ইবলিসের অনুগামী এবং আল্লাহ্‌র মুখলেস বান্দার স্বতন্ত্র অবস্থান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, “এরপর ইবলিস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমার সমস্ত অর্জন (ফেরেশতাদের নেতা হিসেবে প্রাপ্ত সম্মান) ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছেন, আমিও পৃথিবীতে (সকল ধরনের পাপাচারকে) মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তাদের পথভ্রষ্ট করব (শেষার প্রতিনিধি হিসেবে তাদের মর্যাদাকে ধুলিস্যাৎ করে দেবো)। আমার কবল থেকে শুধু তারাই রক্ষা পাবে, যারা আপনার সত্যিকারের অকপট বান্দা। আল্লাহ্‌ বললেন, আমার কাছে পৌঁছানোর এটাই সরল পথ। আমার সত্যিকার বান্দাদের উপর তোমার কোন প্রভাবই কার্যকরী হবে না। তোমার প্রভাব তাদের উপরই থাকবে, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে (শেষে) তোমাকে অনুসরণ করবে এবং তোমার অনুসারী সকলের নিবাস হবে জাহান্নাম”-(সূরা হিজর:১৫:৩৯-৪৪)। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ‘অবকাশ’ প্রাপ্ত ইবলিস প্রধানত মানব সন্তানের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানব অন্তর প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তৎপরতা শুরু করে। মানব হৃদয়ে কুমন্ত্রণা, কুভাবনা, কুকর্ম, দলাদলি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, রক্তপাত, জুলুম, নির্যাতন, গিবত, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, প্রতারণার মতো খারাপ দিকগুলো উসকে দেয়ার লক্ষ্যে ইবলিস নানা প্রকার ছলনার মাধ্যমে মানুষকে তার বশীভূত করার জন্য বিরামহীন তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে যায়। এ সময় মানব অন্তরে ভাল-খারাপের দ্বন্দ্ব মানুষ যদি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুরাগী হয়ে কার্য-সম্পাদন করে তখন ইবলিসের প্রভাবেই নফসই বিজয়ী হয়ে থাকে। অথচ ‘আল্লাহ্‌র নির্দেশ’ ‘রূহ’-কে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নির্দেশনার অনুবর্তী রাখার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের পরম ও চরম সাফল্য।

প্রতিটি মানব সন্তান ফিত্রত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু

পৃথিবীতে অবস্থানকালে ধীরে ধীরে পরিবেশগত কারণে মানুষের ফিৎরতে পরিবর্তন আসে। এতে মানব আত্মা ক্রমশঃ নানা রকম অপকর্ম এবং অপদৃশ্যে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। পৃথিবীর বৃক্কে লোভনীয় পণ্য সামগ্রী, সম্পদরাজি, ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি, বিলাস সামগ্রী প্রভৃতির প্রতি মানবের মোহ এবং ভোগ দখলের আকর্ষণ সৃষ্টি করে ইবলিস সর্বাবস্থায় ছলনা-প্রতারণার জাল বিস্তার করে থাকে। পৃথিবী মানব সন্তানের জন্য পরীক্ষাগার। হাদিস শরিফ অনুযায়ী ‘ইহকাল পরকালের কৃষিক্ষেত্র।’ মূলতঃ ইহকাল মানুষের ঈমান-আমলের ফলিত ক্ষেত্র। ইহকালের কর্মফলের উপর পরকালের মুক্তি এবং চিরন্তন শান্তি ও বিরহ বিচ্ছেদের অবসান শেষে অনন্ত মিলনের শুভ দিকটি জড়িয়ে আছে। আল্লাহ প্রদত্ত এ স্বাধীনতা অব্যাহত নয়। আল্লাহ প্রদত্ত এ স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট নীতি এবং বিধানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট সীমারেখা বর্ণিত আছে। মানবকে প্রদত্ত ইচ্ছার স্বাধীনতায় ইবলিস অনুপ্রবিষ্ট হয়ে মানুষকে সর্বাবস্থায় অপরাধ-অপকর্মে নিয়োজিত রাখে। ইবলিসকে প্রদত্ত ‘অবকাশ’ সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন, “(আল্লাহ বললেন) যাও, তোমার কণ্ঠ দ্বারা যাকে পারো মোহিত করে সত্য থেকে সরিয়ে নাও। সর্বশক্তি নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো, ওদের ও ওদের সন্তানদের যতো পাপাচারে নিমগ্ন করা যায় করো, যতো ধরনের প্রতিশ্রুতি পারো দাও। কিন্তু (তারা বুঝতে পারবে না যে) শয়তানের প্রতিশ্রুতি তো শ্রেফ ছলনা”- (সূরা বনি ইসরাঈল:১৭:৬৪)। উপর্যুক্ত আয়াতের মর্মানুসারে দেখা যায় ইবলিস মানব অন্তরে অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ও কুভাবনার বিস্তার ঘটিয়ে লোভ-প্রলোভনের কালো আস্তরণকে মোহনীয় ও উপজীব্য করে তুলে। মানুষকে প্রদত্ত ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে তাই অত্যন্ত সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, “আমি মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করেছি, এখন তাদের ইচ্ছা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক অথবা অকৃতজ্ঞ হোক। আমি তো সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও গনগনে আগুন”-(সূরা দাহর:৭৬:৩-৪)। উপর্যুক্ত তথ্যানুসারে পর্যালোচনা করা যায় যে, ক. আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারী দাঙ্কিক ইবলিসকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষকে বিভ্রান্ত এবং পথভ্রষ্ট করার ‘অবকাশ’ দিয়েছেন। খ. একমাত্র অকপট তথা অকৃত্রিম বান্দারা ইবলিসের প্ররোচনায় কোনভাবে প্রভাবিত হবেন না। গ. এ অবস্থায় আল্লাহ মানুষকে হেদায়েত গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করা বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ‘ইচ্ছার স্বাধীনতা’ দিয়েছেন। মানুষ ইচ্ছা শক্তির

স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে মূলতঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে চরম পরীক্ষায় নিপতিত হয়ে থাকে। মানুষের ইচ্ছাশক্তির সুযোগকে অব্যাহত করার প্রলোভন উসকে দিয়ে ‘অবাধ স্বাধীনতা’ নামে ইবলিস (অপশক্তি) নানামুখি প্ররোচনায় আকর্ষণ সৃষ্টি করে মানুষকে অপকর্মে দুর্দমনীয় করে তোলে। এ ধরনের অবস্থান থেকে মানব ‘রুহ’কে অহংকারী-দাঙ্কিক ইবলিসের প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত করে অকপট-অকৃত্রিম বান্দায় রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজন হয় উত্তম ও সত্য পথ প্রদর্শক ‘হাদী’র। নবুয়ত যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তা সম্পন্ন করেছেন। নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটলে পথ প্রদর্শক হিসেবে ‘উলিল আমর’ এর কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে সূরা নিসার:৪:৪৯ আয়াতে উল্লেখ আছে, “হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস করো তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং উলিল আমরের (যাঁরা তোমাদের মধ্যে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর অনুগত এবং রাসূলুল্লাহর অনুগামী হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং প্রাজ্ঞ। যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুন্দর করতে প্রতিশ্রুত)। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটিই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।” মানববাত্মাকে সুউচ্চ নৈতিক মানে উজ্জীবিত করার বিষয়ে প্রশিক্ষক ও পথ প্রদর্শক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আরো ঘোষণা করা হয়েছে, “তবে (যুদ্ধের সময়) মোমিনদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া সমীচীন নয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি অংশ অবশ্যই যুদ্ধ যাত্রায় বিরত থেকে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। এ জ্ঞানীরাই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা যোদ্ধাদের নৈতিক সত্যজ্ঞানে সচেতন করে তুলবে। ফলে তারা অন্যান্য থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে”- (সূরা তাওবা:৯:১২২)। এ বিষয়ে উম্মুল কুরআন ‘সূরা ফাতিহা’য় উল্লেখ আছে, “আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন, তাঁদের পথে যাঁদের আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন”- (সূরা ফাতিহা:১:৫-৬)। উল্লেখ করা সঙ্গত যে, আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত বান্দাদের পথ অনুসরণের হেকমত শক্তি সামর্থ্য প্রদানের জন্য বান্দা আল্লাহর নিকট সদয় আর্জি পেশ করছেন প্রতিদিন প্রতিটি নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় ‘সূরা ফাতিহা’ পাঠ করার মাধ্যমে। এ বিষয়ে মহানবী (দ.) উল্লেখ করেছেন, “আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” অন্যত্র হুজুর (দ.) বলেছেন, “প্রতিটি

যুগেই আমার উন্মত্তের মধ্যে কমপক্ষে চল্লিশজন লোক হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর চরিত্রে চরিত্রবান থাকবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে।” এ ধরনের চরিত্রধারার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যগাথায় উল্লেখ করেছেন, “ইসলাম সে তো পরশ মনি, তারে কে পেয়েছে খুঁজি, পরশে তার সোনা হলো, যাঁরা তাঁদের মোরা বুঝি।”

পবিত্র কুরআন এবং হাদিস শরিফের নির্দেশনা অনুযায়ী দেখা যায় নবী-রাসূলের উপর আল্লাহ পৃথিবীতে মানব জাতির হেদায়ত প্রাপ্তির পথ নির্দেশকের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। নবী-রাসূলের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক হচ্ছে ‘অলীউন’ হিসেবে। অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহর বন্ধু হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। আল্লাহর বন্ধু হিসেবে তাঁরা আল্লাহর পক্ষ হতে মুখ্য পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের অকপট অনুসারীরা হলেন ‘নাজাত’ প্রাপ্ত। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটলে আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে হেদায়তের পথ প্রদর্শনের দরোজা বন্ধ রাখেন নি। এ জন্যে আল্লাহ ‘মুখলেস বান্দা’র বিষয়টি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। ‘মুখলেস বান্দা’ বিতাড়িত ইবলিসের প্রলোভন-প্রতারণা মুক্ত থেকে মানুষকে সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ সকল পথ প্রদর্শকরা হলেন আল্লাহ প্রেমিক বান্দা। তাঁরা পৃথিবীতে বসবাসকালে দুনিয়ার লোভ-লালসা-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তির আকর্ষণ ও জীবন ধারা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে অনাড়ম্বর ভাবে কালাতিপাত করে থাকেন। তাঁরা হক এবং ন্যায়ের প্রতীক- ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’। তাঁরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পিত এবং অনুকরণযোগ্য সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা কপটতা বিনাশকারী এবং সত্য বিষয়ে সুদৃঢ়। তাঁদের কথা এবং কাজ সত্য এবং ন্যায়ের ‘মিজান’। তাঁরা আয়নার মতো স্বচ্ছ, কুসুমের মতো কোমল এবং অন্যায় অন্যায় বিষয়ে বজ্রকঠিন। তাঁরা আল্লাহ এবং রাসূলের পরম অনুগত কৃচ্ছতা সাধনকারী। এ ধরনের মহৎ চরিত্রবানরা হলেন নবুয়ত পরবর্তী সময়ের পথ প্রদর্শক। কালের রূপান্তরে তাঁরা তাসাওউফপন্থী হিসেবে পরিচিত। মহানবী (দ.) এর সাহাবা-ই কিরাম এ ধরনের জীবন পদ্ধতির উদাহরণ। অর্থাৎ সে সময় সাহাবা-ই কিরাম ঈমান, আমল, ইবাদত এবং নিত্য নৈমিত্তিক কর্মকাণ্ডে তাসাওউফ ধারায় নিজেদেরকে পরিচালিত করে মানব সমাজের জন্য অনুকরণীয় জীবন উপমা রেখে গেছেন। সে সময় এ ধরনের পবিত্র জীবনাচারে তাসাওউফ

শব্দ ব্যবহৃত না হলেও পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠা তাসাওউফের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহ নবী-রাসূল-সাহাবা-ই কিরামের জীবনধারারই কাঠামোগত প্রতিফলন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

তাসাওউফ সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তির জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর একটি বাণী আলোচনায় আসা স্বাভাবিক। হযরত নুমান ইবন বশির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেন, “মনে রেখো, শরীরে এক টুকরো গোশত পিণ্ড আছে। সেটি পরিশোধিত হলে গোটা দেহই পরিশোধিত হয়ে যায়। সেটি বিগড়ে গেলে গোটা দেহই বিগড়ে যায়। জেনে নাও সে পিণ্ডটি ‘কুলব’।”- (সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, জামে আত তিরমিযী)। হযরত ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, “কোন কোন লোক বরাবর মিথ্যা বলতে থাকে। জেনে বুঝেই মিথ্যা বলে। এতে তাদের কুলবে কালো দাগ পড়ে যায়। এভাবে একসময় পুরো অন্তর কালো হয়ে যায়”-(মুয়াত্তা-এ ইমাম মালেক)।

সুফিদের মতে মিরাজ শরিফে মহানবী (দ.) আল্লাহর নূরের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। সুফি পরিভাষায় তা হচ্ছে ‘ফানা ফিল্লাহ’। মিরাজ শরিফ থেকে মহানবী (দ.) এর পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তনকে সুফিরা বলেন ‘বাকা বিল্লাহ’। অর্থাৎ ‘বাকা বিল্লাহ’ স্তরে উপনীত হলে বান্দার সমস্ত কাজই আল্লাহর নির্দেশ এবং ইচ্ছানুরূপে সম্পন্ন হয়। তখন প্রেমিক-প্রেমাস্পদের ইচ্ছা এক ও অভিন্নভাবে প্রকাশ পায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মানব অন্তরে দেহের অংশ হিসেবে অবস্থিত ‘মাংসের টুকরা’ যা ‘কুলব’ নামে প্রশংসিত তা মানুষের অপকর্ম অপচিন্তা-হিংসা-বিদ্বেষ-পরশ্রীকাতরতার কারণে নূর হারিয়ে গাঢ় কালো হিংস্র-পাষণ পাথরে রূপ নেয়। মানব অন্তর তখন কালো আবরণে এতো বেশি পর্দাবৃত থাকে যে অন্তরে উদিত সকল ইচ্ছাই ইবলিস নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। ইবলিস নিয়ন্ত্রিত মানবদেহ ফেরাউন, নমরুদ, বখতে নাসার সহ পৃথিবীর কুখ্যাত জালিম, অত্যাচারী মানবাধিকার হরণকারী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে নিন্দনীয় হয়। মানুষ আল্লাহর খলিফা। নিন্দনীয় চরিত্র লালনের জন্য আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান নি। বরং আল্লাহর ‘রঙ’ অর্জনের মাধ্যমে খলিফার মর্যাদা রক্ষার জন্যে প্রেরণ করেছেন।

ইসলাম ধর্মে তাসাওউফ ধারণা স্পষ্ট হয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর মিরাজ শরিফের ঘটনাপঞ্জীর আলোকপ্রাপ্ত হয়ে। মিরাজ শরিফ সংঘটিত হয়েছে মহানবী (দ.) এর নবুয়ত প্রকাশের পর। তাসাওউফপন্থীদের নিকট মিরাজে মোস্তফা অতিমূল্যবান বিষয়। কারণ মিরাজের ঘটনাপঞ্জী কোন প্রকার সংশয় ব্যতীত স্বীকার করার নাম ঈমান। মিরাজের বর্ণনা শ্রবণ করা মাত্র বিন্দুমাত্র সংশয় ব্যতীত বিশ্বাস করার কারণে হযরত আবু বকর 'সিদ্দীক ই আকবর' তথা বিশ্বাসীদের নেতা অভিধায় সম্মানিত ও সম্বোধিত হয়েছেন।

মিরাজ শরিফের জাহেরী সালাতে পঞ্জিগানা 'ফরয আহকাম' উপহার হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য ঘোষণা দেয়া হয়। অর্থাৎ ঈমান এর পর বন্দেগীর প্রধান আনুষ্ঠানিক বিধান পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মুসলমানদের জন্য জারী হয়। সালাতে (নামায) উপস্থিত হবার জন্যে দৈহিক পবিত্রতা অর্জন অত্যাাবশ্যিক। এজন্যে ওজু করার নিয়ম ও বিধান রয়েছে। নামাযে কেবলামুখি হয়ে দণ্ডায়মান হতে হয়। সালাতের নিয়ত (ইচ্ছা-অভিপ্রায়) করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তিকে পূর্ণমাত্রায় সালাতের বিধানের নিয়ন্ত্রণে সংযত ও সংহত রাখতে হয়। এক কথায় সালাতের নিয়ত করার পর মানুষের চোখ, কান, হাত, পা প্রভৃতি স্বেচ্ছাধীন কর্মস্পৃহা শক্তি ও চেষ্টাকে বন্দী করে ফেলা হয়। তখন একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা শক্তির নির্দেশনাই সালাতে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে অনুশীলন করতে হয়। দাঁড়ানো অবস্থায়, রুকু, সিজদা এবং বসা সবই নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হয়। এ নিয়ম অনুশীলন করে মুমিন মাত্রই মনকে একাত্ম করে আল্লাহর প্রেম এবং বন্দেগীত্ব গ্রহণ করে থাকেন। সালাতে আল্লাহর প্রতি পরম আনুগত্য প্রকাশের পরম নিদর্শন হচ্ছে 'সিজদা'। এ সময় বান্দা তাঁর কৃত অপরাধ মার্জনা চেয়ে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে থাকেন। তখন মানব দেহের শীর্ষ অংশ মস্তক মাটিতে নত করে কপাল মাটিতে লাগিয়ে প্রেমাস্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সমস্ত অহমিকা, দাস্তিকতা ও অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হয়। সালাত আদায়ের এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্যের ভাবাদর্শ জনসমাজে নিজেকে সংযত জীবনাচারে অভ্যস্ত করার প্রশিক্ষণ। সালাত সম্পর্কিত এ ধারণার নাম 'তাসাওউফ'। এ কারণে সুফিদের দৃঢ় বিশ্বাস 'তাসাওউফ' হচ্ছে মানব অন্তরে শুদ্ধতা আনয়নের শ্রেষ্ঠ পন্থা। মিরাজ শরিফে মানব মুক্তির নির্দেশনা হিসেবে ইলমে শরিয়ত, ইলমে তুরিকত, ইলমে মারিফত এবং হাকীকত প্রবর্তিত হয়। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার শহর হিসেবে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনকালে

মহান আল্লাহ একটি ইলমের ব্যাপারে মহানবীর (দ.) প্রতিশ্রুতি আদায় করে জানিয়ে দেন, "এ ইলম এমন বিষয় কোন সৃষ্টিই তা সহ্য করতে পারবে না।" দ্বিতীয় প্রকার ইলম প্রকাশ করা না করার স্বাধীনতা মহানবী (দ.)কে প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় প্রকার ইলম প্রত্যেক খাস এবং আম জনসমষ্টির নিকট প্রকাশ করার জন্য মহানবী (দ.) আদিষ্ট হন। মিরাজ শরিফের আলোকে মহানবী (দ.) নির্দেশিত মানব অন্তর পরিশুদ্ধির প্রক্রিয়ার নাম তাসাওউফ।

তাসাওউফ পন্থীরা 'ফানা ফিল্লাহ'র দীক্ষা নেন মিরাজ শরিফের ব্যঞ্জনা থেকে। মিরাজ শরিফের প্রবহমান নূরের প্রবল শ্রোতে মহানবী (দ.) এর আশ্রয় গ্রহণ, বিনম্র আচরণ প্রদর্শন এবং প্রেমালিঙ্গনে (মুআনাক্কার) অবিচল অবস্থায় ধৈর্য সংযম সংরক্ষণের ধারাটি সুফিরা অনুশীলনে তৎপর থাকেন। সুফিদের মতে মিরাজ শরিফে মহানবী (দ.) আল্লাহর নূরের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। সুফি পরিভাষায় তা হচ্ছে 'ফানা ফিল্লাহ'। মিরাজ শরিফ থেকে মহানবী (দ.) এর পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তনকে সুফিরা বলেন 'বাকা বিল্লাহ'। অর্থাৎ 'বাকা বিল্লাহ' স্তরে উপনীত হলে বান্দার সমস্ত কাজই আল্লাহর নির্দেশ এবং ইচ্ছানুরূপে সম্পন্ন হয়। তখন প্রেমিক-প্রেমাস্পদের ইচ্ছা এক ও অভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। তাসাওউফ মূলতঃ ঐশী প্রেমজাত-প্রেমশক্তি বিষয়ক বিধান। এ বিধান অনুযায়ী প্রেমাস্পদের রাহে প্রেমিককে জীবন, মান, সম্মান, বিত্ত-বৈভব-আত্মীয়-স্বজন-প্রথা-নিয়ম-কানুন-রীতি সবকিছু কুরবানী দিয়ে প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি অর্জনকে একমাত্র ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। এটি মূলতঃ আল্লাহর বিধানগত প্রেম তত্ত্ব। এ বিধানের কারণে হযরত নূহ (আ.) স্বীয় অবাধ্য পুত্র কেনানকে পরিত্যাগ করতে নির্দেশ প্রাপ্ত হন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈলকে (আ.) কুরবানী দিতে নির্দেশিত হন। হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মুসা (আ.) প্রতিপক্ষের চরম বিরোধিতার মুখে প্রিয় জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য হন। প্রেম বিধানের শর্ত হিসেবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ স্বীয় পিতা হযরত আবদুল মোত্তালিব কর্তৃক কুরবানী প্রদানের জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হন। প্রেম পরীক্ষায় নিপতিত হয়ে হযরত ইউনুসকে (আ.) চল্লিশ দিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়। হযরত জাকারিয়াকে (আ.) করাত দিয়ে কেটে শহীদ করা হয়। হযরত ঈসাকে (আ.) শহীদ করার জন্য শূলের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকৃত অর্থে নবী-রাসূলদের জীবনকেন্দ্রিক এ সকল ঘটনাপঞ্জীতে রয়েছে আল্লাহর প্রেমতত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ নির্দেশনা। (চলবে)

জীবনালেখ্য

তাসাওউফের সাধক কবি দার্শনিক শেখ সাদি (র.)

● ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ ●

মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা এবং এই পবিত্র বেলায়তের দর্শন ও স্বরূপ উন্মোচনে এক উচ্চস্তরের গ্রন্থ ‘বেলায়তে মোত্লাকা’। জ্ঞান-সাগর এবং মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার রূহানী ভাষ্যকার ও অলি-আল্লাহ্ খাদেমুল ফোকারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) রচিত গ্রন্থ ‘বেলায়তে মোত্লাকা’য় পারস্যের সুফিকাব্যের শীর্ষস্থানীয় কবি হযরত শেখ সাদি (র.) এর কাব্যগ্রন্থ গুলিস্তাঁ থেকেও ভাবনির্ঘাস এবং উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

তাসাওউফ সাধক, কবি, দার্শনিক এবং মানবহিতৈষী শেখ সাদি (র.) এক বিস্ময়কর মনীষা। মধ্য যুগে পারস্যে জন্ম নিয়েও একবিংশ শতাব্দীর ঘোর আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতায় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়ে চলেছেন। সব মত, পথ, ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষের কাছে তিনি এতোই গ্রহণযোগ্য যে তাঁর নাম উচ্চারণ মাত্রই জ্ঞান চর্চাকারী মানুষেরা নড়েচড়ে বসেন। আধুনিককালের অনেক কবিই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে খ্যাতিমান হয়েছেন। তাঁর সমাদর প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, সবকালে সব দেশে রয়েছে। তাঁর দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাণী, শিক্ষা মানব জীবনের উপর বিশদ পর্যবেক্ষণ মানব জাতির জন্য এক অফুরন্ত সম্পদে পরিণত হয়েছে। তিনি হয়ে উঠেছেন মহাকবি থেকে বিশ্বকবি। বাণী ও বচনে মহান আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বা আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ, সব সময়ই তাঁর প্রসঙ্গের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সাধনা, সংগ্রাম, জ্ঞান আহরণ এবং জগতের নানা প্রান্তে ব্যাকুল পরিভ্রমণ তাঁর জীবনকে করেছে ঘটনাবহুল, বর্ণাঢ্য ও বহুমাত্রিক। মধ্যযুগে জন্ম নিয়েও আজও কেনো তিনি সর্বকালের আধুনিক মানুষ বলে অভিহিত হন, এই প্রশ্নের জবাব তাঁর সৃষ্টি সম্ভারের ভেতরেই রয়ে গেছে।

তাঁর প্রতিটি কবিতাই নিছক কবিতা নয়। সে সব কবিতার শুরু ও শেষে রয়েছে জীবনের নানা উপলব্ধি থেকে আহরিত গল্প। কোথাও মহান স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিকুলের আলোকিত বাগান, কোথাও ঊষর মরুতে রৌদ্রদগ্ধ জীবন, কোথাও ফুলের সৌরভ, আবার কোথাও বা পাখীদের দলবদ্ধ কলকাকলিতে মহান আল্লাহ্‌তায়ালার অকুণ্ঠ গুণগান। শেখ সাদি (র.) সবকিছুকেই স্পর্শ করেছেন।

শেখ সাদি (র.) এর জীবনালেখ্যের খুটিনাটি তুলে ধরার আগে একথাটি নিশ্চিত করে বলা যায়, তাঁর সম্পর্কে যারা লিখেছেন তাঁরা কোনো না কোনোভাবে আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়েছেনই। কখনও কোথাওবা অনেক লেখক তাঁর মৌলিক চিন্তা ও

কবিতার ভাষার উপর কলম বসাতে, অনুবাদ করতে, যাকে ইংরেজিতে Reconstruction-ও বলা হয়ে থাকে; সে রকম করতে সাহস করেন নি। শেখ সাদি (র.) যে কোথাও নিষেধ করে গেছেন, তা কিন্তু নয়। বাংলাদেশের কিছুকাল আগের কথা সাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, কিংবা সমসাময়িককালের কাব্যানুবাদক, এমন আরও অনেকে সাদি’র (র.) প্রতি আবেগ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। নাতে রাসূল (দ.) রচনা প্রসঙ্গে সবার আগে বলা যাক। যাকে বলা যায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ.) এর প্রশংসা করে রচিত কাব্যসৃষ্টিতে হযরত শেখ সাদি (র.) কীভাবে সময়কে অতিক্রম করলেন এবং নবী (দ.)-এর প্রতি ভালবাসায় বিশ্বকে জয় করলেন তা সর্বত্রই উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন।

মহাকবি শেখ সাদি (র.) এর গুলিস্তাঁ (গুলিস্তান) বাংলা কাব্যানুবাদের শুরুতে সেই বিখ্যাত নাতে রসূল (দ.) বা মহানবী (দ.) এর প্রশস্তিমূলক কাব্যটি তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে এরকম: “শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, নিখিল বিশ্বের গৌরব, সর্বকালের সর্বযুগের আদর্শ পুরুষ শেষ নবী, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)। তিনি মহা সম্মানিত। জ্ঞান বণ্টনকারী, সুন্দর দেহবিশিষ্ট উত্তম চরিত্রবান নবী।

উদ্ধৃত নাট ১.

বালাগাল উলা বি কামালিহী,
কাশাফাদ দুজা বি জামালিহী,
হাছনাত জামিউ খিছোয়ালিহী,
সাল্লু আলাইহি ও আয়ালিহি।

কাব্যানুবাদ পর্বে এসে কোন কোন কবি বলেছেন, এই নাতে রসূল (দ.) পৃথিবীর সকল ভাষায় আপন সত্তায় আরবি ভাষাতেই মধুময় সুরে সমাদৃত। অন্য কোনো ভাষায় এই নাতে কাব্যানুবাদ কঠিন প্রচেষ্টার শামিল। তাই অনেকে এই মহৎ কাব্যের বাংলা কাব্যানুবাদে হাত দেয়ার সাহস করেন নি। কারণ যত শক্তিশালী কাব্যানুবাদই হোক না কেন আরবি মূল সুরের কাছাকাছি যাওয়াই অসম্ভব।

লেখক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁর ‘পারস্য প্রতিভা’ গ্রন্থের শেখ সাদি অধ্যায়ে সেবা’র সীমাহীন তাৎপর্য নিয়ে শেখ সাদি (র.) রচিত দুই পংক্তির একটি কবিতা দিয়ে লেখাটি শেষ করেছেন। কবিতাটির মূল ফার্সি হচ্ছে:

‘তরিকৎ বজুজ খেদমতে খালক্ নিস্ত,
বতসবিহ ও ছাজ্জাদা ও দলক্ নিস্ত।’

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ এর বঙ্গানুবাদ করেছেন এভাবে:

‘তরিকৎ কিছু নয় বিশ্বসেবা বিনা;
খেরকা তসবি, জা’নামায-নহেকো সাধনা।’
তাসাওউফের দৃষ্টিতে সাধক মানবাত্মা সরাসরি মহান স্রষ্টার নৈকট্য পেতে পারেন। তবে তার জন্য প্রয়োজন তুরিকা বা নৈকট্য অর্জন প্রক্রিয়া। তারও চেয়ে বেশি প্রয়োজন আল্লাহুতায়ালার দয়া। শেখ সাদি (র.) তাঁর বিভিন্ন কবিতায় পরমপ্রিয় খোদাতায়ালার এবং তাঁর উপাসনায় নিয়োজিত সাধকের নানা অবস্থা তুলে ধরেছেন। তাঁর একটি বয়াত, যা হচ্ছে: ‘করম বিই ওয়া লুৎফ খোদা ওয়ান্দগার/ গুনাহ বান্দা করদস্ত ইউ শবমেসার।’ এই কবিতার ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে: পবিত্র কা’বায় বসে এক সাধক দরবেশ তাঁর ইবাদতের অপূর্ণাঙ্গতার কথা স্বীকার করছেন। তিনি এও স্বীকার করছেন খোদাতায়ালার অফুরন্ত মহিমা ও গুণাবলি জানার মতো শক্তি তাঁর নেই। দরবেশ আল্লাহকে প্রশ্ন করছেন, ‘যদি কেউ তোমার (আল্লাহুতায়ালার) অফুরন্ত মহিমা ও গুণাবলি সম্বন্ধে আমার মতো অধমের কাছে জানতে চায়, তবে আমি তোমার অঙ্গ প্রেমিক, তোমার কী বর্ণনা দেব? কারণ আশেক এখন মাশুকের দ্বারা আহত বা নিহত। এই রকম মাশুক হত্যাকারী হয়ে উঠায় (তাসাওউফের উপলব্ধির ব্যাপক ও পবিত্র অর্থে) আশেক ‘টু’ শব্দটিও উচ্চারণ করতে পারছেন না। কারণ মাশুক তাঁকে হত্যা করুন এটা আশেক পছন্দ করছেন এবং তাতে তিনি খুশি থাকছেন।

সুফি দর্শনের ভাববিভোরতায় ভরপুর আরো উচ্চাঙ্গের কথা সুরের আরোহ নিয়মে সরগমের স্বরধ্বনির সূক্ষ্মস্তর অতিক্রম করে আরো উপরে স্বচ্ছন্দ-সতর্কতায় ধ্বনি-দোলা ও মূর্ছনায় উর্ধ্বাকাশে উঠে যাচ্ছে। হযরত শেখ সাদি (র.) এর সুফি কাব্যে এই অনুভূতি হয়।

তাসাওউফের ভাব-আনন্দে আল্লাহুতায়ালার প্রেমে মত্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা হযরত শেখ সাদি তাঁর এই কাব্যে তুলে ধরেছেন। কাব্যটি (কিত’আ) হচ্ছে: ‘আয় মোরগে সেহের ইশক যে পরওয়ানা বিয়ামুয/ কাঁ সুখতারার কাঁ শোদ ও আওয়ায নাইয়ামদ।’ এই কবিতার ব্যাখ্যায় বলা হলো: হে প্রভাতের বুলবুলি, তুমি পতঙ্গের কাছে প্রেম শেখো। পতঙ্গ যেভাবে আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা হয়ে নিজের খুশিতে নিজেকে আঙুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ছাই করে, তেমনি আল্লাহুতায়ালার প্রেমিকরা আল্লাহ প্রেমে মত্ত হয়ে নিজেকে বিস্মৃত হয়, আত্মবিলীনতায় লীন হয়ে যায়। প্রেমিক আল্লাহুতায়ালার অপরিসীম রূপের ধ্যানে মগ্ন হয়ে যায়। তখন তাঁর কাছে আল্লাহ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে কিছুই উত্তর দিতে পারেন না। আল্লাহর অসীম মহিমা ও জালালিয়তের (মহাত্ম্যের সর্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি) কাছে তাঁর জ্ঞান হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। মাওলানা শেখ সাদি (র.) এই কিত’আ বা কাব্যাংশের শেষে একটি শিক্ষণীয় ভাষ্যও (ইংরেজিতে যাকে বলে মরাল

রেখেছেন)। সেটি হলো: আত্মবিসর্জন বা আত্মসমর্পণ ছাড়া আল্লাহ-প্রেম সম্ভব নয়। ইংরেজিতে ‘সাবমিশন’ শব্দটির অর্থ যদি আনুগত্য ধরা হয়, তাহলে তা পূর্বোক্ত ভাষ্যের কাছাকাছি যায়। তাই আল্লাহকে পেতে হলে চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দিতে হবে। কারণ চাওয়া-পাওয়ার তাড়না নিয়ে আত্মসমর্পণ বা আনুগত্য পূর্ণাঙ্গ হয় না।

আল্লাহপ্রেমের চাঞ্চল্যে অধীর সাধকের আল্লাহপ্রাপ্তির অবস্থা সম্পর্কে শেখ সাদি (র.) এর একটি অসাধারণ কাব্য এটি: ‘ঈ মুদাইয়া দর তলাশ বে-খবর আনন্দ/ কাঁরা-কে-খবর শোদ খবরাশ বায নাইয়ামদ।’ এই কবিতার কাব্যানুবাদটি বাংলায় সুন্দরভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। তাই এটি তুলে ধরা হলো: ‘বে-খবর আল্লাহপ্রেমিক আল্লাহ যখন চিনতে পায়/ খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে অসীমতে হারিয়ে যায়।’ এই কাব্যের ব্যাখ্যার সারাংশ হলো: একজন অনভিজ্ঞ আল্লাহপ্রেমিক বা আল্লাহ অন্বেষণকারী যখন আল্লাহুতায়ালার সন্ধান পান বা আল্লাহ সম্পর্কে অবগত হন, তখন তাঁর আর কোনো ইহজাগতিক খবর থাকে না। অর্থাৎ সে নিজেকে সেই পবিত্র অসীমত্বের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন। পরিপূর্ণ আত্মহারা হয়ে যান।

শেখ সাদি (র.) তাঁর জীবনে রাজানুগ্রহে নয়, রাজপ্রীতিতে ধন্য হয়েছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে সে সময়কার ফারেস প্রদেশের শাসনকর্তা আতাবিক-ই-ফারিস সাদ ইবনে জঙ্গীর ভূয়সী প্রশংসা করে কয়েকছত্র কথা তিনি লিখেছেন। সাদি’র পিতা আবদুল্লাহ শিরাজী এই শাসকেরই অধীনে রাজ সরকারের কর্মচারী ছিলেন। একজন শাসক কতোটা মহৎ হলে শেখ সাদি (র.) এর মতো একজন কবির লিখিত ভাষ্যে প্রশংসিত হতে পারেন তার প্রমাণ সাদ ইবনে জঙ্গী নিজেই। এই প্রশংসার কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করা যাক: ‘সে সময়ের বাদশাহ হিসেবে তিনি হযরত সোলাইমান বাদশাহ’র মতো ছিলেন। তাঁর রাজ্যের উপর আল্লাহর রহমতের ছায়া বিস্তৃত ছিলো। হে আল্লাহ! তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকো এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট রাখো, তোমার রহমতের দৃষ্টি দিয়ে তাঁর বাসস্থান উৎকৃষ্ট করে দাও। কারণ, তোমার বিশেষ বিশেষ বান্দাগণ এবং জনসাধারণ তাঁর ভালবাসায় দ্বীন-ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো।’

একজন মহৎ শাসকের দয়া ও গুণগ্রাহীতার গুণে কী অপূর্ব কাব্য উপমা ও ব্যঞ্জনা তৈরি হতে পারে শাসক সাদ ইবনে জঙ্গীকে নিয়ে শেখ সাদি (র.) এর লেখা একটি রুবাই এবং একটি কিত’আ তার প্রমাণ। রুবাইয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ সাদি বলেন: ‘আমার মধ্যে অনেক দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মহান বাদশাহ আমার দিকে যখন গুভ দৃষ্টি দিলেন, তখন থেকে আমার দোষ-ত্রুটি ছাপিয়ে আমার সুখ্যাতি সারাবিশ্বে প্রচার হতে লাগলো। (পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

● আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একনজরে এই পনেরটি দিক নির্দেশনা হলো-

১. নারীকে পর্যাপ্ত-উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া উচিত, যাতে ইসলামী প্রশিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জিত হয়। প্রথম বিষয়টি হলো নারী যেন সর্বোত্তমরূপে গৃহ ও সন্তানাদির তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয় এবং বিয়ের পর তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো উপযুক্ত পেশাগত কাজের জন্য নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগানো যায়।
২. নারীর কাজ-কর্মের সময়কে পূর্ণরূপে ব্যবহার করে সমাজের জন্য উৎপাদন ও কল্যাণকর উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং যৌবন, প্রৌঢ়তা ও বার্ধক্য কোন পর্যায়ে এবং কন্যা, স্ত্রী, তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা কোন অবস্থাতেই কর্মহীন ও বেকার না থাকা।
৩. স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ করবে আর পিতা তার কন্যার। কিন্তু কোন মহিলার যদি এমন অবস্থা হয় যে তার অভিভাবক হিসেবে এদের কেউ নাই তবে তার ব্যয় বহন করবে রাষ্ট্র।
৪. পুরুষ পরিবারের ব্যবস্থাপক তাই স্ত্রীগণ পেশাগত কাজের জন্য পুরুষের অনুমতি নিবে। অর্থাৎ স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি নিবে এবং কন্যা তার পিতার অনুমতি নিবে।
৫. মুসলিম নারীর নিজের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং পবিত্র ও চরিত্রবান সমাজগঠনের জন্য অবিলম্বে বিয়ে করা বৈধ অথবা অত্যাৱশ্যক।
৬. পারিবারিক-আর্থিক সামর্থ্য ও সমাজের গণ্ডির মধ্যে মুসলিম নারী সন্তান উৎপাদনে উৎসাহী হবে। পেশাগত কাজ তাকে এ দায়িত্ব থেকে বিরত রাখুক তা মোটেই সমীচীন নয়।
৭. নারী তার ঘর ও সন্তানাদির উত্তমরূপে দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী। বিবাহিত নারীর জন্য এটি প্রাথমিক মৌলিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য পেশাগত কাজ পরিত্যাগ করা সংগত।
৮. দুটি অবস্থায় পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ করা নারীর জন্য অত্যাৱশ্যক। ১. পরিবারের জন্য উপার্জনশীল ব্যক্তির (পিতা, স্বামী অথবা রাষ্ট্র) অবর্তমানে বা তার অক্ষমতার কারণে নিজের ও পরিবারের জীবিকার জন্য। ২. মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্তে নারীদের জন্য ফরযে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজ সমূহ আদায় করার

- সময়। এ অবস্থায় পরিবার-সন্তান-সন্ততির প্রতি দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব অত্যাৱশ্যকীয় কাজ যথা সম্ভব আঞ্জাম দেয়ার জন্য নারী চেষ্টা করবে।
৯. পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার শর্তে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে পেশাগত কাজ নারীর জন্য 'মানদূব' (মুস্তাহাব, নফল)। ১. দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা, ২. মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করা, ৩. কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।
 ১০. পেশাগত কাজের চাপ বেশী থাকলে ঘর-কন্নার কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা স্বামীর জন্য উত্তম। কিন্তু পেশাগত কাজটি যদি অত্যাৱশ্যকীয় শ্রেণীর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে সাহায্য করাও স্বামীর জন্য অত্যাৱশ্যকীয়।
 ১১. স্ত্রীর উপার্জিত অর্থ স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে খরচ করবে।
 ১২. যে সব কার্যকারণ কর্মজীবী মহিলাদেরকে তাদের পারিবারিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে তার প্রস্তুতির জন্য সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজ দায়ী।
 ১৩. নারীর বৃত্তিমূলক কাজের ব্যাপারে মুসলিম সরকার দুটি মৌলিক বিষয়ে দায়িত্বশীল: ১. সরকারী কাজে নিয়োজিত বিবাহিত পুরুষদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে, যাতে তাদের পরিবার সচ্ছল হয় এবং তাদের স্ত্রীদের পেশাগত কাজে অংশ নিতে না হয়। ২. সরকারের অধীনে কোন বৃত্তিমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
 ১৪. যে সব পেশাগত কাজ নারীর প্রকৃতি এবং তার দৈহিক-মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূল, তা থেকে নারীকে রক্ষা করতে হবে। এধরনের কাজ দুই প্রকার- ১. শরিয়ত প্রণেতা সে সব বৃত্তিমূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছে। ২. মুসলমানগণ যে সব কাজে নিয়োগ থেকে নারীদের বিরত রাখতে চায়।
 ১৫. পেশাগত কাজে নারীর অংশগ্রহণ যে ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাক্ষাতের দাবি করে সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পর অংশগ্রহণের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে।

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও ইসলাম

সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম যথাযথ ও যুৎসই দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। একজন নারী বিভিন্নভাবে সম্পত্তির মালিক হতে পারে। যেমন- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি,

বিয়ের সময় প্রাপ্ত দেন-মোহর, উপহার হিসেবে প্রাপ্ত সম্পত্তি ইত্যাদি। এইসব সম্পত্তিতেই নারীর অধিকার সুনিশ্চিত ও নির্ধারিত। মহান আল্লাহর বাণী- “হে বিশ্বাসীগণ! যে সব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের একে অপরের তুলনায় অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন, তোমরা সে ব্যাপারে লোভাতুর হয়ো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা পুরুষ পাবে, আর নারী যা অর্জন করে তা নারী পাবে। সবসময় আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। আল্লাহ সব বিষয়ে সবকিছু জানেন”-(সূরা নিসা:৪:৩২)। নারীর অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তার সম্পত্তিতে অধিকার। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদে নারীর অধিকার নিয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও নারী

সব ধন-সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ। কুরআনের বাণী- “মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর”-(আয়াতাতংশ, সূরা বাকারা:২৮৪)। তিনিই মানুষকে সাময়িকভাবে এই সম্পদ ভোগ করার অধিকার দিয়েছেন। যেহেতু তিনিই প্রকৃত মালিক তাই সম্পত্তি বন্টনের নীতি প্রদানও তাঁর অধিকার। সম্পত্তি বন্টনের এই যথাযথ নিয়ম-পদ্ধতি পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহুতায়াল্লা সেখানে যাদের মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছেন এবং যার যতটুকু অংশ নির্ধারণ করেছেন তারা ততটুকু সম্পদের মালিক হবে। মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি মহান আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার এ নিয়মকে ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ‘ফারাইয’ বলা হয়। ইসলামী আইন শাস্ত্রে এ সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র বিভাগ রয়েছে। একে বলা হয় ‘ইলমুল ফারাইয’। সাধারণভাবে ‘ফারাইয’ শব্দটি ‘ফরিদাতুন’ এর বহুবচন। যার আভিধানিক অর্থ- নির্ধারণ করা, চূড়ান্ত রূপে স্থির করা, ফরয, নির্দিষ্ট অংশ, সম্পত্তির অংশ ইত্যাদি। আর যে শাস্ত্র ‘ফারাইয’ নিয়ে আলোচনা করে তাকে ‘ইলমুল ফারাইয’ বলে। সুতরাং ‘ইলমুল ফারাইয’ এর আলোচ্য বিষয় মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি, তার উত্তরাধিকারী এবং তাদের প্রাপ্য অংশ। আর এর উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে তার প্রাপ্য অংশ প্রদান করা। মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া ধন-সম্পদকে আরবিতে বলা হয় ‘মিরাস’ বা ‘তুরিকা’। আর উত্তরাধিকারীর আরবি প্রতিশব্দ হলো ‘ওয়ারিস’। যার মৃত্যুর কারণে অন্যরা ওয়ারিস হয় অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয় ‘মুরিস’। তাই আমাদের দেশে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিকে ‘মুরিসি’ সম্পদ বলা হয়। ‘মুরিসি’ সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ সবার অধিকার রয়েছে তা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে- “পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে

নারীরও অংশ আছে। তা অল্প হোক বা বেশি, এ অংশ আল্লাহর নির্ধারিত”-(সূরা নিসা : ৭)। আয়াতের অর্থালোকে প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে নারীর নির্ধারিত অংশ উত্তরাধিকারী কে কে এবং তাদের নির্ধারিত অংশ কতটুকু তা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী- “আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তি) সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন: এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান, শুধু মেয়ে দুই-এর বেশি রেখে গেলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি এক মেয়ে থাকে তবে সে পাবে অর্ধেক। তার সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকেই সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হলে যদি শুধু পিতামাতা তার উত্তরাধিকারী হয় তবে মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ; কিন্তু যদি তার ভাইয়েরা থাকে তবে তার মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ; অবশ্য এ সবই হবে মৃত ব্যক্তির অসিয়তের দাবি পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের বেশি আপন, তা তোমরা জানো না। এই হচ্ছে আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য, যদি তারা নিঃসন্তান হয়। তাদের সন্তান থাকলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাবে, অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে স্ত্রীরা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, যদি একটি সন্তান থাকে তবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ স্ত্রীরা পাবে, তোমাদের অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা নিঃসন্তান হয় এবং মা-বাবাও মারা গিয়ে থাকে কিন্তু এক ভাই বা বোন জীবিত থাকে তবে তারা প্রত্যেকে পাবে এক ষষ্ঠাংশ, আর যদি তারা সংখ্যায় বেশি হয় তবে তারা এক তৃতীয়াংশ পাবে, তবে সবটাই হবে অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর-কারো অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এই হচ্ছে আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল। (উত্তরাধিকারের ব্যাপারে) এই হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণাধারা। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল সাফল্য। অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর বিধান লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে জ্বলবে চিরকাল। তার জন্যে অপেক্ষা করছে অপমানকর শাস্তি”-(সূরা নিসা:১১-১৪)। “অনেকেই আপনার কাছে বন্টন-বিধান সম্পর্কে জানতে চায়। হে নবী! তাদের বলে দিন, আল্লাহ বিধান দিচ্ছেন যে, যদি কোন নিঃসন্তান ব্যক্তি মারা যায় যার মা-বাবা মারা গেছে, তার একজন বোন থাকলে সেই বোন তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

আর বোন যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয় তবে তারা সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। আর যদি কয়েকজন ভাইবোন থাকে তবে বোনেরা একভাগ আর ভাইয়েরা দুভাগ পাবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর বিধান সুস্পষ্টভাবে বয়ান করেছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন”-(সূরা নিসা:১৭৬)।

পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতগুলোতে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস কারা এবং তাদের কার কত অংশ তা স্পষ্ট করা হয়েছে। তবে এই আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে কিছু বিষয় জেনে রাখা জরুরি। মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির দু'ধরণের হতে পারে। ১. তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র। যেমন- পোশাক-আশাক, তৈজসপত্র, অলংকার-অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। ২. বিষয়-সম্পত্তি। যেমন- জমি-জমা, টাকা-পয়সা, ব্যবসার মালামাল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এই দু'ধরনের সম্পদের সবগুলোই তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি বা মিরাস হিসেবে গণ্য হবে। আর মৃত ব্যক্তির জীবিত ওয়ারিসগণ শুধু এই সম্পত্তি পাবে।

তবে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তার জীবিত ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টনের আগে তিনটি কাজ করতে হবে। সেগুলো হলো- ১. তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে কোন ক্রটি করা যাবে না।

২. মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করবে।

৩. মৃত ব্যক্তির অসিয়ত পূরণ করতে হবে।

অর্থাৎ তার রেখে যাওয়া সম্পদ দিয়ে প্রথমে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ হতে ঋণ পরিশোধ (যদি থাকে)। এরপর অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তার বৈধ অসিয়ত পূরণ করা। অসিয়ত পূরণের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশের বেশি ব্যয় করা যাবে না।

এই কাজগুলো করার পর মৃতের অবশিষ্ট সম্পত্তি মহান আল্লাহ নির্দেশিত নির্দিষ্ট অংশ অনুপাতে বন্টন করতে হবে। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১১-১৪ এবং ১৭৬ নং আয়াতে যে সব ওয়ারিসদের বর্ণনা করা হয়েছে তারা হলেন- ৪ জন পুরুষ ও ৮ জন নারী।

৪ জন পুরুষ হলেন- ১. পিতা, ২. দাদা অর্থাৎ পিতার পিতা, তার পিতা এভাবে উর্ধ্বতন পুরুষ দাদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন। ৩. বৈপিত্রের ভাই (মাতা একই, কিন্তু পিতা ভিন্ন) এবং ৪. স্বামী।

আর ৮ জন নারী হলো- ১. স্ত্রী, ২. কন্যা, ৩. পুত্রের কন্যা, ৪. সহোদরা বোন, ৫. বৈমাত্রেয় বোন (পিতা একজন, কিন্তু মা ভিন্ন), ৬. বৈপিত্রের বোন, ৭. মাতা ও ৮. দাদী-নানী। দাদীর মাতা, নানীর মাতা - এ ধারায় উর্ধ্বক্রমে সকলেই দাদী-নানীর মধ্যে গণ্য হবেন।

পবিত্র কুরআনে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে ছয়টি অংশের কথা বর্ণিত হয়েছে। সে গুলো হলো- অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ,

এক-অষ্টমাংশ, দুই-তৃতীয়াংশ, এক তৃতীয়াংশ এবং এক-ষষ্ঠাংশ।

ওয়ারিস মূলত তিন প্রকার। যথা- ১. যাবিল ফুরুয, ২. আসাবাহ এবং ৩. যাবিল আরহাম।

১. যাবিল ফুরুয হলো- যে ৮ জন নারী ও ৪ জন পুরুষের প্রাপ্য অংশের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তারা।

২. আসাবাহ হলো- যাবিল ফুরুয এর অংশ বন্টনের পর অবশিষ্ট সম্পদ যাদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

৩. যাবিল আরহাম হলো- মৃতের এমন আত্মীয় যারা যাবিল ফুরুয এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

উপরে বর্ণিত ৪ জন পুরুষ ওয়ারিসের মধ্যে ২ জন কখনো সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয় না। তারা হলো- পিতা ও স্বামী। অপর দু'জন অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো বঞ্চিত হয়। আর ৮ জন মহিলা ওয়ারিসের মধ্যে মাতা, স্ত্রী, কন্যা এ তিনজন কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত হয় না। বাকিরা অবস্থার প্রেক্ষিতে বঞ্চিত হতে পারে। [আরো বিস্তারিত জানার জন্য ইলমুল ফারায়েয এর কিতাব সমূহ দেখুন]

এই আলোচনা হতে একথা বুঝা যায় যে, ইসলামী শরিয়ত মৃত ব্যক্তির সম্পদের মধ্যেও নারীর অধিকার নিশ্চিত করেছে। সে মাতা হোক, স্ত্রী হোক কিংবা কন্যা হোক অবশ্যই সম্পদের অংশিদার হবে। আর যদি বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রের বোন, পুত্রের কন্যা কিংবা দাদী-নানীও হয় তবে সম্পদের অংশিদার হবে কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা বঞ্চিতও হতে পারে। নিচে মহিলাদের অংশ ও অবস্থাগুলো আরো স্পষ্ট করা হলো।

স্ত্রীর মিরাস:

স্ত্রী তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে অংশ পাবে। স্ত্রীর দুটি অবস্থা-

১. মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকলে স্ত্রী তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির চারভাগের একভাগ সম্পদ পাবে।

২. আর সন্তান থাকলে আট ভাগের একভাগ পাবে।

কন্যার মিরাস:

কন্যা তার পিতার সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। তার তিনটি অবস্থা-

১. কন্যা যদি একজন হয় এবং মৃতের কোন পুত্র সন্তান না থাকে তবে, ঐ একজন কন্যা মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২. কন্যা যদি একাধিক হয় এবং মৃতের কোন পুত্র সন্তান না থাকে তবে, ঐ কন্যাগণ সকলে একসাথে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

৩. আর যদি কন্যার সাথে পুত্র থাকে তবে কুরআনে বর্ণিত 'এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান' নীতিতে সম্পত্তি বন্টন হতে।

পুত্রের কন্যার মিরাস:

মৃতের সম্পত্তি পুত্রের কন্যাদেরও তথা পৌত্রীদেরও অংশ রয়েছে। তাদের ৬টি অবস্থা-

১. যদি মৃতের পুত্র-কন্যা না থাকে, কেবল একজন পৌত্রী থাকে তখন ঐ পৌত্রীর মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।
২. যদি মৃতের পুত্র-কন্যা না থাকে, কিন্তু একাধিক পৌত্রী থাকে তখন ঐ একাধিক পৌত্রীর সবাই মিলে মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।
৩. যদি মৃতের পুত্র-কন্যা না থাকে, কিন্তু একজন পৌত্র এবং এক বা একাধিক পৌত্রী থাকে তখন ঐ এক পৌত্রের কারণে বাকি পৌত্রী বা পৌত্রীগণ 'আসাবা' হয়ে যাবে। এ অবস্থায় 'যাবিল ফুরুয'দের অংশ বন্টনের পরে তারা বাকি সম্পত্তি পৌত্র-পৌত্রীদের মধ্যে 'এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান' নীতিতে বন্টন করা হবে।
৪. মৃত ব্যক্তির যদি এক কন্যা থাকে (পুত্র/প্রপৌত্র না থাকে) এবং তার সাথে একাধিক পৌত্র থাকে, তবে পৌত্রীর অংশ এক-ষষ্ঠাংশ। একজন হোক বা একাধিক হোক তাদের অংশ এক-ষষ্ঠাংশই হবে।
৫. মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক কন্যা সন্তান থাকে তবে পৌত্রী বঞ্চিত হবে। এ অবস্থায় যদি পৌত্রীর সাথে পৌত্র থাকে তবে তারা 'আসাবা' হিসেবে মিরাস পাবে।
৬. মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান থাকলে পৌত্রী বঞ্চিত হবে।

আপন বোনের মিরাস:

মৃতের সম্পত্তির মধ্যে সহোদর বা আপন বোনও অংশ পাবে।

আপন বোনের ৪ অবস্থা-

১. মৃতের সহোদর বোন একজন হলে এবং তার পুত্র-কন্যা না থাকলে, ঐ বোন তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।
২. মৃতের সহোদর বোন যদি একাধিক হয় এবং তার পুত্র-কন্যা না থাকে তবে, ঐ একাধিক বোন সবাই মিলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।
৩. সহোদর বোনের সাথে যদি সহোদর ভাই থাকে তবে, ভাইয়ের কারণে বোন 'আসাবা' বা অবশিষ্টভোগী হয়ে যাবে এবং সহোদর ভাই-বোনরা 'এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান' নীতিতে সম্পত্তির অংশিদার হবে।
৪. যদি মৃতের কন্যা বা পৌত্রীর সাথে সহোদর বোন থাকে তবে সহোদর বোন 'আসাবা' হয়ে যাবে এবং 'যাবিল ফুরুয'দের সম্পত্তি বন্টনের পর অবশিষ্ট অংশ সহোদর বোন পাবে।

বৈমাত্রেয় বোন:

মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোনও ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক মিরাস পাবে। তার ৭ অবস্থা-

১. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোন একজন হলে এবং সহোদর বোন না থাকলে ঐ বৈমাত্রেয় বোন 'যাবিল ফুরুয' হিসেবে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।
২. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোন একাধিক হলে এবং সহোদর বোন না থাকলে ঐ বৈমাত্রেয় বোনগণ 'যাবিল ফুরুয'

হিসেবে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

৩. মৃতের একজন মাত্র আপন বোন থাকলে এবং তার সাথে বৈমাত্রেয় বোন থাকলে তবে এ অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন এক-ষষ্ঠাংশ পাবে (মেয়েদের সর্বোচ্চ মিরাস দুই-তৃতীয়াংশ পূরণের জন্য)।
৪. মৃত ব্যক্তির দুই জন সহোদর বোন থাকলে বৈমাত্রেয় বোন মিরাস পাবে না।
৫. মৃত ব্যক্তির যদি দুই জন সহোদর বোন থাকে সাথে বৈমাত্রেয় বোন ও ভাই থাকে তবে এই অবস্থায় বৈমাত্রেয় ভাই-বোন আসাবা হয়ে যাবে এবং 'যাবিল ফুরুয'দের অংশ বন্টনের পর অবশিষ্ট সম্পদের 'এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান' নীতিতে সম্পত্তির অংশিদার হবে।
৬. যদি মৃতের কন্যা বা পৌত্রীর সাথে বৈমাত্রেয় বোন থাকে তবে বৈমাত্রেয় বোন 'আসাবা' হয়ে যাবে এবং 'যাবিল ফুরুয'দের সম্পদ বন্টনের পর অবশিষ্ট অংশ বৈমাত্রেয় বোন পাবে।
৭. মৃতের পুত্র, পৌত্র (এভাবে যত নিচের দিকে হোক), পিতা, পিতামহ, আপন ভাই, দু'জন আপন বোন অথবা একজন আপন বোন সেই সঙ্গে কন্যা বা পৌত্রী জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয় বোন মিরাস পাবে না।

বৈপিত্রেয় বোনের মিরাস:

বৈপিত্রেয় বোনও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হয়। তার ৩ অবস্থা-

১. মৃত ব্যক্তির যদি একজন বৈপিত্রেয় বোন থাকে, তবে সে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।
২. দুই অথবা ততোধিক বৈপিত্রেয় বোন থাকলে তাদের অংশ এক-তৃতীয়াংশ। বৈপিত্রেয় ভাই-বোন সমান অংশ পাবে। তাদের বেলায় নারী-পুরুষের তারতম্য হয় না। সুতরাং পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাওয়ার নিয়ম বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।
৩. মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা অথবা পৌত্র, পৌত্রী (যত নিচের দিকে হোক), পিতা, দাদা- এদের কারো বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন মিরাস পাবে না।

মাতার মিরাস:

মৃতের মাতাও তার ওয়ারিস হবে। মাতার ৩ অবস্থা-

১. মৃতের মাতার সাথে ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী (যত নিচে হোক) কেউ জীবিত থাকলে মা তার সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক ভাই-বোন অথবা বৈমাত্রেয় ভাই-বোন অথবা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন অথবা একাধিক প্রকারের মিশ্রিত ভাই-বোন যাই হোক না কেন, এ অবস্থায় মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।
২. উপরে বর্ণিত আত্মীয়দের অবর্তমানে মাতা তার মৃত সন্তানের সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে।

(চলবে)

ফীহি মা ফীহি (মওলানা রুমীর উপদেশ বাণী)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই মুহূর্তে আমি আপনার ঔরসে স্ত্রী ও গর্ভ ছাড়াই এক লক্ষ পুত্র সন্তান পয়দা করতে পারি। বস্তুতঃ আমি নিদর্শন দেখালে এক গোটা জনগোষ্ঠীর পয়দা হবে, সম্পূর্ণভাবে গঠিত ও পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় তা হবে। আমি কি আপনাকে রুহের জগতে পিতা বা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করিনি? আপনি কেন এ কথা ভুলে গিয়েছেন?”

আম্বিয়া (আঃ) ও আউলিয়া (রহঃ)-বৃন্দের পদমর্যাদা ও (মৌলিক) বৈশিষ্ট্য এবং মানবের বহু হালত তথা অবস্থাকে একটি রূপক দ্বারা চিহ্নিত করা যায়: গোলামদেরকে অমুসলিম রাজ্যগুলো হতে মুসলমান রাজ্যে বের করে আনা হয়, যেখানে তাদেরকে বিক্রি করা হয়। কাউকে আনা হয় পাঁচ বছর বয়সে, কাউকে দশ, আবার কাউকে বা পনেরো বছর বয়সে। যাদেরকে শিশু বয়সে আনা হয়, তারা মুসলমান রাজ্যে লালিত-পালিত হয়ে স্বদেশের কথা পুরোপুরি ভুলে যায়। তাদের স্মৃতিপটে আর সেটির কোনো লেশচিহ্নও থাকে না। একটু বড় যাদেরকে আনা হয়, তারা সামান্য কিছু মনে রাখতে পারে। আরো বড় যারা, তারা অনেক বেশি মনে রাখে। পরবর্তী জগতে সবাই আল্লাহুতা'লার সামনে উপস্থিত থাকবেন। সেখানে খাদ্য ও রিযিক হবে খোদার বাণী, যা অক্ষরবিহীন ও শব্দহীন। এ জগতে যারা শিশু হিসেবে এসেছে, তারা যখন ওই (খোদায়ী) ভাষণ শোনে, তখন তারা নিজেদের পূর্ববর্তী অবস্থার কিছুই স্মরণ করতে পারে না, আর তারা নিজেদেরকে ওই (খোদায়ী) ভাষণের সাথে অপরিচিত মানুষ হিসেবেই দেখতে পায়। তারা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে আল্লাহুতা'লার কাছ থেকে রয়েছে পর্দার আড়ালে। কেউ সামান্য স্মরণ করতে সক্ষম হন, আর তখন-ই অপর জগতের জন্যে তাঁদের আকুল আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাঁরা সত্যকে খুঁজে বের করেন। তাঁরাই হলেন ঈমানদার। কেউ কেউ ওই (ঐশী) ভাষণ যখন শোনে, আল্লাহুতা'লার উপস্থিতি তাঁদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়, ঠিক যেমনটি বহু আগে (আলমে আরওয়ায়) হয়েছিল। এমতাবস্থায় পর্দা সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয়, আর তাঁরা (আল্লাহুর) দীদারপ্রাপ্ত হন। এঁরাই হলেন আম্বিয়া (আঃ) ও আউলিয়া (রহঃ)।

এক্ষণে আমি আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে বলছি, ঐশী সত্যের (সুন্দরী) বধূরা যখন তাদের চেহারা আপনাদের অভ্যন্তরে প্রদর্শন করবে এবং তাদের গোপন রহস্য যখন প্রকাশ পাবে, তখন সাবধান, অপরিচিত কাউকে এ কথা বলবেন না। আপনারা যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা অন্য কাউকে

জানাবেন না; আর আমার এসব কথাও সবাইকে বলবেন না। “যারা জ্ঞানের অযোগ্য তাদের তা শিক্ষা দেবেন না, পাছে জ্ঞানের প্রতি করা হয় অন্যায়। আর যোগ্যদের থেকে তা আটকে রাখবেন না, পাছে তাদের প্রতি করা হয় অন্যায়।”

কোনো সুন্দরী ও মনোমোহন প্রেমিকা (বধূ) আপনার বাড়িতে যদি নিজেকে একান্তে আপনার কাছে সমর্পণ করে এ কথা বলে, “আমাকে কারো সামনে প্রদর্শন করবেন না, কেননা আমি আপনারই”, তাহলে তাকে বাজারে নিয়ে ‘প্যারেড’ করানো এবং ‘এসো এই সুন্দরীকে দেখে যাও’, এ ঘোষণা দেয়া আপনার মোটেও উচিত হবে না। আর তা কখনোই ওই ধরনের মনোমোহন নারীর কাছে প্রীতিকরও হবে না। সে আপনার প্রতি রাগান্বিত হবে। (তদনুরূপ) খোদাতা'লা-ও এসব (ভেদের) কথা (প্রকাশ করা) কারো কারো জন্যে অবৈধ করে দিয়েছেন। তবুও জাহান্নামের বাসিন্দাবর্গ জান্নাতের বাসিন্দাদের চিৎকার করে বলবে, “তোমাদের উদারতা ও মানবতা কোথায়? তোমাদের প্রতি আল্লাহুতা'লা প্রদত্ত পুরস্কার ও আশীর্বাদ হতে, দানশীলতা ও সার্বিক দয়া-মায়্যা হতে তোমরা যদি অল্প কিছু পরিমাণ আমাদের প্রতি ছিটিয়ে দাও, তা কি এতোই কঠিন বা কষ্টসাধ্য হবে? আমরা তো (দোষখের) আঙুনে পুড়ছি এবং তাতে গলে যাচ্ছি। ওই সব ফল বা নির্মল বেহেশতী জল হতে দু-এক ফোঁটা আমাদের আত্মার ওপর ছিটালে তাতে কী আসে যায় (তোমাদের)?” বেহেশতের বাসিন্দাবৃন্দ তখন উত্তরে বলবেন, “আল্লাহু পাক এগুলো তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন। এই আশীর্বাদের বীজ আমাদের (দুনিয়াতে) পূর্বকার আমল হতেই আগত। যেহেতু তোমরা ঈমানদারী, আন্তরিকতা ও উত্তম কর্মসহ এই বীজ বপন ও চাষ করো নি, সেহেতু এখানে তোমরা কী ফসলই বা পাবে? উদারতার দরুন যদিও আমরা এটি (মানে ফসল) তোমাদের সাথে ভাগাভাগি করি, তথাপিও তোমাদের পুরস্কার না হওয়ার কারণে এটি তোমাদের গলা পুড়িয়ে ফেলবে এবং অন্নালীতে আটকে যাবে।”

হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে একবার একদল মোনাফেক ও অপরিচিত লোক আগমন করে। তারা বিভিন্ন রহস্য নিয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করে এবং মহানবী (দঃ)-এর প্রশংসা করতে থাকে। হযর পূর নূর (দঃ) তাঁর সাহাবা (রাঃ)-বৃন্দের দিকে ফিরে বলেন, “তোমাদের পাত্রগুলো ঢাকো।” এ কথার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছিলেন, “অপরিচিত লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান-প্রজ্ঞা গোপন রাখো, আর তাদের উপস্থিতিতে তোমাদের মুখ বন্ধ

করো এবং জিহ্বা টেনে ধরো; কেননা তারা হুঁদুর এবং এই (ঐশী) জ্ঞান ও করুণার যোগ্য নয়।” আমাদের সাহচর্য থেকে এইমাত্র বিদায় নেয়া আমীর (রাজ্যের শাসক) যদিও আমরা কী বলছিলাম তা বিস্তারিত বুঝতে পারেননি, তবুও তিনি সাধারণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে আমরা তাঁকে খোদার (রাস্তার) দিকে আহ্বান করছিলাম। আমি তাঁর মাথা নাড়ানো, মমত্বপূর্ণ স্মিতহাস্য ও জযবাতের (ধর্মীয় আবেগের) আকস্মিক প্রবাহকে তাঁরই উপলব্ধির আভাস বা চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করেছি। গ্রাম হতে মানুষেরা শহরে এসে নামাযের আযান শুনতে পেলে এর বিস্তারিত অর্থ না জানা সত্ত্বেও তারা এর উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

উপদেশ বাণী -১৬

মওলানা রুমী (রহঃ) বলেন: প্রেমাস্পদ যে কেউই সুন্দর, কিন্তু এর মানে এই নয় যে সুন্দর যে কেউই প্রেমাস্পদ হতে সক্ষম। মজনুনকে লোকেরা বলতো, “লায়লার চেয়েও সুন্দরী নারী আছে; আপনার সামনে কয়েকজনকে পেশ করার সুযোগ আমাদের দিন।” মজনুন জবাব দিতেন, “আমি লায়লাকে তার দৈহিক আকৃতির জন্যে ভালোবাসি না। সে আমার হাতে একখানা কাপের (পানপাত্রের) মতো। আমি তা দ্বারা শরাব পান করি। তোমাদের দৃষ্টি পানপাত্রের ওপরেই নিবদ্ধ, কিন্তু তোমরা শরাব সম্পর্কে কিছুই জানো না। দামী পাথর-খচিত সোনার পাত্রে যদি অল্পস্বাদযুক্ত সিরকা থাকে, তা আমার কী উপকারে আসবে? পুরোনো ভাঙ্গা লাউয়ের খোসা যদি শরাবপূর্ণ হয়, তবে তা আমার চোখে একশ’টি সোনার পানপাত্র হতেও উত্তম।” কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা ও আবেগতাড়িত হতে হবে যদি শরাবকে পানপাত্র হতে তার আলাদাভাবে চিনতে সক্ষম হতে হয়। এটি দশদিন যাবত অভুক্ত ব্যক্তি এবং প্রতিদিন পাঁচ বেলা আহারকারী ব্যক্তির মতোই একটি বিষয়। উভয়েরই এক টুকরো রুটির প্রতি দৃষ্টি। পেট পুরে খাওয়া ব্যক্তি তাতে আরো খাবার দেখতে পায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষটি তাতে খোদ জীবনকে দেখতে পান। এই ক্ষুধার্তের কাছে এ রুটি একটি পানপাত্র, আর যে জীবন এটি বয়ে আনে তা শরাব। এ ধরনের শরাব সম্পর্কে কোনোক্রমেই জানা যাবে না, খিদে ও প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছাড়া। এই ক্ষুধা অর্জন করুন যাতে আপনারা আকৃতির দৃশ্যমান হওয়াই শুধু দেখতে না পান, বরং প্রেমাস্পদ (খোদাতালা)-কেও সর্বত্র খুঁজে পান। এই জগতের আকৃতিগুলো পানপাত্রের মতো। বিজ্ঞান, কলা ও জ্ঞান হচ্ছে তার ওপর খোদাইকৃত লিপি। পানপাত্র যখন ভেঙ্গে যায়, ওই সব অভিলিখনও অদৃশ্য হয়ে যায়। অতএব, যারা ওই শরাব পান করেন, তাঁরা দেখেন “চিরন্তন বাস্তবতা, পবিত্র তথা পুণ্যময় কর্ম” কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাইলে তাকে প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে যে, তার নিজের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, এবং দ্বিতীয়তঃ এমন জ্ঞান (জগতে) বিদ্যমান যেটি সম্পর্কে

সে কিছুই জানে না। তাই প্রবাদ আছে, “জিজ্ঞাসা করাটা জানার অর্ধেক।” কিন্তু এ জগতে একজনকে অবশ্যই সর্বদা থাকতে হবে যিনি সব জানেন। সবাই কারো না কারো দিকে চেয়ে থাকে, কেননা চূড়ান্তভাবে আমরা খোদারই (সান্নিধ্য) অব্বেষণ করি। কিন্তু এমন একজনকে অবশ্যই সবসময় থাকতে হবে যিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে আঘাতকারী ও অন্য কারো ধনুকের তীরে আঘাতপ্রাপ্তের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারেন। কোনো দেয়ালের ভেতর দিয়ে আসা আওয়াজ শুনতে পেলে আপনারা জানেন দেয়ালটি কথা বলছে না, বরঞ্চ ওই কণ্ঠস্বর অন্য কারোর হবে। আউলিয়া (সূফী-দরবেশ) এ ধরনের। তাঁরা মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন [মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণ করে (আল-হাদীস)], আর তাঁরা দরজা ও দেয়ালের মতো হয়ে গিয়েছেন। (খোদাতালা হতে) এমন কি এক চুল পরিমাণ পৃথক অস্তিত্ব-ও তাঁদের অবশিষ্ট নেই। বাস্তবতার (অর্থাৎ, খোদার) হাতে তাঁরা হলেন বর্মকিন্তু এই বর্ম নিজ ক্ষমতাবলে চলেন না।

তাই সূফী/দরবেশবৃন্দ বলেন, “আনাল হক্ক”, আমি-ই সত্য। এর মানে “আমি মোটেও কিছু নই, আল্লাহর ক্ষমতাবলেই পরিচালিত হই।” এই ধরনের বর্মকে খোদা (-এর প্রতিনিধি) হিসেবে দেখে বা বিবেচনা করে। এই খোদাগতদের বিরুদ্ধে সহিংস হয়ো না। কেননা, এই বর্মের (মানে আউলিয়ার) প্রতি আঘাত করা খোদ মহান আল্লাহ্‌তালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল।

প্রত্যেক ওলী-দরবেশই আল্লাহ পাকের প্রামাণ্য দলিল। নারী ও পুরুষের মর্যাদা ও মকাম দরবেশের সাথে তারা কী রকম আচরণ করে, তা দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তারা ওই সূফী বুয়ূর্গের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হলে বলতে হবে তারা স্বয়ং খোদাতালা’র সাথেই শত্রুতাভাব পোষণ করে। আর দরবেশের প্রতি মিত্রতা রাখলে আল্লাহ্‌তালার সাথেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়।

“যে কেউ তাঁদের দেখা পেলে আমারই দর্শন পায় তাঁদের খোঁজ পেলে যেন আমাকেই খুঁজে পায়।” আল্লাহ্‌তালার আউলিয়া (রহঃ)-বৃন্দ তাঁর ভেদের রহস্য সম্পর্কে অবগত। এই ঐশী গোপন রহস্যের সাথে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, যেটি “পরিশুদ্ধ (তায়কিয়া-প্রাপ্ত) জন ছাড়া কেউই স্পর্শ করতে সক্ষম নয়।” কোনো মহান ওলী/দরবেশের মাযারের দিকে যদি তাঁরা পিঠ দিয়ে দাঁড়ান, তবে তা অবাধ্যতা বা অবহেলার কারণে নয়, বরঞ্চ তাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে ওই ওলীর যাত মোবারক তথা পবিত্র সত্তার দিকেই মুখ ফিরিয়েছেন; কেননা এখানে উচ্চারিত এসব কথা তাঁদেরই (আউলিয়াদেরই) পবিত্র সত্তা। দেহ হতে মুখ ঘুরিয়ে রূহ তথা আত্মার দিকে মুখ ফেরানোয় কোনো ক্ষতি নেই।

এটি আমার একটি রীতি (আচরিত প্রথা) যে আমার কারণে কোনো অন্তর দুঃখ-ভারাক্রান্ত হোক, তা আমি চাই না।

আমাদের (দরবারী) মজলিশে কখনো কখনো বিশাল জনসংখ্যা আমার কাছে ভিড় করে, আর আমার খাদেমবর্গ তাঁদেরকে বাধা দেয়। এটি আমাকে বিব্রত করে। আমি একশ' বার বলেছি, “আমার পক্ষ থেকে কিছু বলো না, আমি তাতেই তুষ্ট।” আমি এব্যাপারে এতোই যত্নবান যে যখন ওই সকল বন্ধু আমার কাছে আসেন (মানে ভিড় করেন), তখন তাঁদেরকে একঘেঁয়েমি দ্বারা বিরক্ত করার দুষ্চিন্তায় আমি শঙ্কিত থাকি; তাই আমি তাঁদেরকে আনন্দ দেয়ার জন্যে কবিতা আবৃত্তি করি। নতুবা কবিতার প্রতি আমার কী-ই বা আগ্রহ? ওয়াল্লাহি (আল্লাহর কসম)! কাব্যের প্রতি আমার কোনো আগ্রহই নেই। অধিকন্তু, আমার দৃষ্টিতে এর চেয়ে মন্দ আর কিছুই নেই। আমার মতে, এটি গরুর নাড়ি-ভুঁড়িতে হাত ঢোকানো সেই বাবুর্চির মতোই, যাকে কোনো মেহমানের ক্ষুন্নিবৃত্তির খাতিরে তা পরিষ্কার করতে হয়।

কোনো সওদাগর আপন নগরীতে কী কী পণ্য প্রয়োজন, তা যাচাই করে দেখেন, আর এও দেখেন মানুষেরা কী কী সামগ্রী কিনতে চান। অতঃপর তাঁরা ওই সব পণ্যসামগ্রী ও সেবা কেনাবেচা করেন, এমন কি যদি তা তাঁদের দৃষ্টিতে সর্বনিম্ন (মানের) বিষয়ও হয়ে থাকে (তা-ও তাঁরা তা করেন)। আমি অনেক জ্ঞানের শাখা অধ্যয়ন করেছি এবং আমার কাছে আগত জ্ঞান বিশারদ ও গবেষক, বুদ্ধিমান ও গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সামনে সূক্ষ্ম, বিরল ও মূল্যবান বিষয়াদি তুলে ধরতে কষ্ট স্বীকারও করেছি। এটি খোদাতা'লা এরাদা (ইচ্ছা) করেছেন (বলেই হয়েছে)। তিনি ওই সব বিদ্যা আমার কাছে জড়ো করেছেন এবং ওই সব কষ্টও একত্রিত করে দিয়েছেন, যাতে আমি এই কাজে মনোনিবিষ্ট থাকি। আমি কী করতে পারি? আমার আপন দেশে এবং আমার স্বজাতির কাছে কাব্যের চেয়ে লজ্জাজনক আর কোনো কিছু নেই। আমি সেখানে থেকে গেলে তাঁদের ধাত বা মন-মানসিকতার সাথে খাপ খেয়ে আমাকে বাঁচতে হতো। তাঁরা যা পছন্দ করেন, তা-ই আমাকে অনুশীলন করতে হতো; যেমন প্রভাষণ দেয়া, বইপত্র প্রণয়ন ও ধর্মপ্রচার। আমীর (রাজ্যশাসক) বলেন: “মূল বিষয় হলো কর্ম।”

মওলানা রুমী (রহঃ) বলেন: এ ধরনের কর্মী কোথায়, যাতে আমি তাদেরকে কর্ম শিক্ষা দিতে পারি? কিন্তু এক্ষণে দেখুন কীভাবে আপনি আপনার কান খাড়া করে শুনছেন; কর্মের পরিবর্তে কথার খোঁজই আপনি করছেন। আমি যদি এ মুহূর্তে কথা বন্ধ করে দেই, তাহলে আপনি নারাজ হবেন। কর্মের অন্বেষণকারীতে পরিণত হোন, যাতে আমি আপনাকে কর্ম প্রদর্শন করতে পারি।

সারা বিশ্বে কর্মের (বিশ্বাসী) ছাত্রদের আমি খুঁজছি, যাতে (তাদেরকে) কর্মের শিক্ষা দিতে পারি। কর্ম সম্পর্কে জানে এমন যে কারো তালাশে আমি দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছি, কিন্তু

কর্মের কোনো ছাত্র খুঁজে পাচ্ছি না; বরঞ্চ শ্রেফ কথারই লোক (পণ্ডিত) পাওয়া যাচ্ছে। এ কারণে আমি কথাতেই মনোনিবিষ্ট। কর্ম সম্পর্কে আপনি কী জানেন? কর্মকে শুধু কর্ম দ্বারাই জানা যায়। এই পথের ওপর কোনো পরিভ্রমণকারী-ই নেই, এটি (রাস্তাটি) একেবারেই ফাঁকা। এমতাবস্থায় আমরা কর্মের সঠিক পথের ওপর চলেছি কী না, তা কীভাবে কেউ দেখতে পাবে?

বাস্তবে নামায ও রোযা কোনো কর্ম নয়, বরং সেগুলো হলো কর্মের আকার-আকৃতি। কর্ম হলো অভ্যন্তরীণ এক বাস্তবতা। পয়গম্বর হযরত আদম (আঃ)-এর যুগ হতে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানা পর্যন্ত নামায ও রোযা তাদের আকৃতির পরিবর্তন করেছে, কিন্তু কর্ম একই আছে।

কর্ম তা নয়, মানুষেরা যা একে ভেবে থাকে। মানুষেরা বিশ্বাস করে কর্ম হচ্ছে এই বাহ্যিক প্রদর্শনী। কিন্তু কোনো মোনাফেক (কপট) লোক শুধু নামায-রোযার মতো (পুণ্যদায়ক) কর্মের (বাহ্যিক) আকৃতি পালন করলে তা তাদেরকে কোনো অর্জন এনে দেয় না। কেননা, তাতে প্রকৃত কর্ম পালনের আন্তরিক ইচ্ছা নিহিত ছিল না।

সকল বিষয় বা বস্তুর গোপন নীতি হচ্ছে ভাষণ ও কথা। আপনি এখনো জানেন না ভাষণ ও বচনের প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে, যার দরুন আপনি সেগুলোকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করছেন। তবে কর্ম-বৃক্ষ হতে উৎপন্ন ফল হচ্ছে ভাষণ, কেননা কর্ম হতেই জন্মলাভ করে বচন। আল্লাহুতালা এ বিশ্বজগত একটি কথা ('কুন' বা 'হও') দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন।

আপনার হয়তো অন্তরে ঈমান বিদ্যমান, কিন্তু যতোক্ষণ না আপনি তা কথা দ্বারা (অন্যদের সাথে) ভাগাভাগি করছেন, ততোক্ষণ তার কোনো মূল্যই নেই। আপনি যখন বলেন, “বর্তমান এই যুগে কথার কোনো মূল্য নেই”, তখন আপনি সেটি কথা দ্বারাই প্রকাশ করেন, তাই নয় কি? কথার যদি কোনো মূল্যই না থাকতো, তাহলে আমরা কেন আপনাকে এ কথা বলতে বচন ব্যবহার করতে দেখি?

কেউ একজন জিজ্ঞেস করেন: “আমরা কোনো নেক আমল (পুণ্যদায়ক কর্ম) পালন করলে এবং খোদাতা'লা হতে উত্তম পুরস্কার পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা (অন্তরে) পোষণ করলে তা কি আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে?”

মওলানা রুমী (রহঃ) উত্তর দেন: আল্লাহর শপথ! আমাদের সবসময়ই আশা (অন্তরে) রাখতে হবে।

আকীদা-বিশ্বাস স্বয়ং আশঙ্কা ও আশার সমষ্টি। কেউ একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আশা নিজে নিজেই উত্তম, কিন্তু শঙ্কা আবার কোনটি?’ উত্তরে আমি বললাম, ‘আমাকে এমন শঙ্কা দেখান যা'তে আশার অন্তিত্ব নেই; কিংবা এমন আশা যা'তে ভয়-ভীতি নেই? এই দুটো অবিচ্ছেদ্য।’ উদাহরণস্বরূপ,

কোনো এক চাষী গমের চাষ করেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি আশা করেন যে ওই গম বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে তিনি উদ্ভিদের কোনো রোগ অথবা খরা দ্বারা সেটি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকেও মুক্ত নন। শঙ্কাহীন কোনো আশার অস্তিত্ব নেই, যেমন নেই আশাহীন শঙ্কার অস্তিত্ব-ও।

আমরা যখন কোনো পুরস্কার পাওয়ার প্রত্যাশা করি, তখন আমাদের চেষ্টা নিশ্চিতভাবে আরো বেড়ে যায়। প্রত্যাশা আমাদের পাখায় পরিণত হয়; আর আমাদের ডানা যতো শক্তিশালী হয়, ততোই দূরে উড়ে যাওয়া যায়। অপরদিকে, আমরা যদি আশাহত হই, তাহলে আমরা অলস হয়ে পড়ি এবং কারো কাছেই আমাদের কোনো মূল্য থাকে না। একজন অসুস্থ ব্যক্তি তেতো ওষুধ গ্রহণ এবং দশটি মিষ্টস্বাদের খাবার বর্জন করতে পারেন, কিন্তু যদি সুস্বাস্থ্যের কোনো আশা আর না থাকে তাহলে কেন অসুস্থ ব্যক্তিবর্গ এই কষ্ট স্বীকার করবেন? আমরা হলাম পশু ও ভাষণের এক মিশ্রণ। আমরা বাহ্যিক (প্রকাশ্য)-ভাবে কথা না বললে অভ্যন্তরে (অন্তরের গভীরে) বলি; নিরন্তর কথা বলি আমরা। আমরা নদীর মতো, যা কর্দমমিশ্রিত। নির্মল জল হলো আমাদের ভাষণ, আর কাদা হলো আমাদের পশুত্ব। কিন্তু আমাদের মধ্যে নিহিত এই কাদা দৈবাৎক্রমে এসেছে। আপনি কি দেখেন না ওই সব মাটির টুকরো কীভাবে ভেঙ্গে পচে গিয়েছে, অথচ মানবজাতির ভালো ও মন্দ ভাষণ, কাব্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অস্তিত্বশীল থেকে গিয়েছে?

পুরুষ বা নারীর হৃদয় (অন্তর) হচ্ছে একেকটি বিশ্বজগত। আপনি তাদেরকে দেখলে সবকিছুই দেখে ফেলেছেন। কেননা, “সর্বপ্রকারের খেলা-ই জঙ্গলি গাধার পেটের ভেতরে বিরাজমান।” বস্তুতঃ হৃদয়সম্পন্ন নর ও নারীর অভ্যন্তরেই এ বিশ্বজগতের সমস্ত সৃষ্টি ধারণকৃত।

“আউলিয়া-দরবেশ হতে পারেন ভালো ও মন্দ, কেউ সে রকম না হলে, দরবেশ নয়, ভণ্ড।” একবার আপনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত (কামেল ওয়াল মোকাম্মেল) ওই সত্তাকে দেখে ফেললে নিশ্চিতভাবে সমগ্র বিশ্বজগতকে দেখে ফেলেছেন। এরপর যে কাউকেই দেখেন না কেন, তা স্রেফ এক পুনরাবৃত্তি। ওই ব্যক্তির ভাষণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত জনের বাণীতে ধারণকৃত। একবার তাঁদের (সূফী-দরবেশদের) বাণী আপনি শুনে থাকলে আপনার শ্রুত তৎপরবর্তী প্রতিটি কথাই একেকটি প্রতিধ্বনি মাত্র।

যে ব্যক্তি যে কোনো জায়গায় ওই ধরনের কাউকে (মানে দরবেশকে) দেখে থাকলে সকল মানব-মানবী, স্থান-কাল-পাত্রকেই দেখে ফেলেছেন। কবি যেমনটি বলেন: “আপনি প্রকৃতই খোদায়ী আদিরূপের প্রতিলিপি, সূর্যের আপন সৌন্দর্যের প্রভা প্রতিফলিত হয় যে কাঁচে, আপনি সেটি, ভেতরে বা বাইরে যেখানেই থাকুক ওই প্রভার উপস্থিতি, সমস্ত

আকাঙ্ক্ষা মঞ্জুর করে তা ঘোষণা করে, ‘এ-ই আমি’

উপদেশ বাণী ১৭

রোমের (কোনিয়া’র) আমীর (রাজ্য শাসক) বলেন: “(মস্কার) কাফের গোষ্ঠী তাদের মূর্তিদের পূজা করতো এবং সেগুলোকে সেজদা করতো। আর এখন আমরা একই কাজ করছি। আমরা মংগলদের কাছে ধরনা দিচ্ছি এবং তাদের সামনে নতজানু হচ্ছি, অথচ নিজেদেরকে আবার আমরা মুসলমান-ও বিবেচনা করছি!” মওলানা রুমী (রহঃ) উত্তর দেন: কিন্তু এখানে পার্থক্য বিদ্যমান; আপনার দৃষ্টিতে এই আচরণটি মন্দ ও সম্পূর্ণভাবে ঘৃণিত। আপনার অন্তরের চোখে এমন অতুলনীয় মহত্তর কোনো কিছু ধরা পড়েছে যা এই আচরণকে গর্হিত ও কদাকার হিসেবে প্রতীয়মান করছে। ঈশৎ লোনা জল তার আপন লবণাক্ততা সেই ব্যক্তির কাছেই সুস্পষ্ট করে তোলে, যিনি মিষ্ট পানির স্বাদ গ্রহণ করেছেন; আর বিভিন্ন বিষয়ের বিপরীত বিষয়গুলো দ্বারাই সেগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অতএব, খোদাতা’লা রুহ তথা আত্মার মাঝে ঈমানদারির নূর (জ্যোতি) প্রোথিত করেছেন যার দরুন (ওপরোক্ত) ওই সব বিষয় গর্হিত হিসেবে (চোখে) ধরা পড়ে। সৌন্দর্যের মোকাবেলায় ওগুলো কুৎসিত বলেই দৃশ্যমান হয়। অথচ অন্যান্যরা (মানে অবিশ্বাসীরা) এভাবে প্রভাবিত হয় না, বরং তারা তাদের বিরাজমান অবস্থায় সম্পূর্ণ খুশি থাকে এই বলে “এ একেবারেই চমৎকার (অবস্থা)।” আল্লাহুতালা আপনার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন; আপনার অভিলাষ আপনারই ধরা-ছোঁয়ায় চলে আসবে। “পাখি উড়ে ডানায় ভর করে, ঈমানদারবৃন্দ উড়েন তাঁদের আকাঙ্ক্ষার পাখায় চড়ে।”

সৃষ্টি তিন ধরনের। প্রথমতঃ ফেরেশতাকুল, যাঁরা হলেন খাঁটি বিবেকসম্পন্ন আত্মা। আল্লাহ পাকের ইবাদত-বন্দেগী, খেদমত ও যিকর-ই তাঁদের প্রকৃতি ও খোরাক। তাঁরা ওই মৌলিক স্বভাবের ওপর টিকে আছেন। মাছ যেমন পানিতে বাঁচে, তেমনি তাঁদেরও ফরাশ ও বালিশ হলো পানি। তাঁরা কামনা-বাসনা হতে মুক্ত ও নির্মল। এমতাবস্থায় তাঁরা এ ধরনের কামনা-বাসনার প্রতি সমর্পিত না হয়ে কোন নেয়ামত-বরকত লাভ করে থাকেন? যেহেতু তাঁরা এধরনের বিষয় থেকে মুক্ত, সেহেতু এগুলোর বিরুদ্ধে তাঁদেরকে সংগ্রাম করতে হয় না। তাঁরা যদি খোদার ইচ্ছাকে মান্য করেন, তাহলে এটিকে আনুগত্য হিসেবে গণ্য করা যায় না; কেননা এ তো তাঁদেরই প্রকৃতি, এর ব্যতিক্রম তাঁরা করতেই পারেন না।

দ্বিতীয় কিসিম হলো জন্তু-জানোয়ার, যারা স্রেফ ভোগবাদী, আর যাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নেই কোনো বিবেকসম্পন্ন আত্মা। ফলে তাদের ঘাড়েও কোনো দায়-দায়িত্বের বোঝা নেই। সর্বশেষে রয়েছে বেচারী মনুষ্য জাতি, যারা বিবেকসম্পন্ন আত্মা ও ইন্দ্রিয়পরবশ সত্তার সমষ্টি।

(চলবে)

শিশু-কিশোর মাহফিল

মহান আল্লাহকে যেভাবে পেলেন নবী হযরত ইব্রাহীম (আ.)

মহান আল্লাহুতায়াল্লা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান, চিরবিদ্যমান, মহাপবিত্র এক প্রেমময় মহাসত্তা। আমরা সবাই একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। মহানবী এবং সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মোজতবা (দ.) এর উম্মত হিসেবে আমরা কতোই না সৌভাগ্যের অধিকারী। কারণ সর্বশেষ নবী হিসেবে তিনি আমাদের বলে গিয়েছিলেন এই তৌহিদের বাণী। এবং তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহুতায়াল্লা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন মহান আল্লাহু'র পবিত্র বাণীসমৃদ্ধ পবিত্র কুরআন। সোনালী বন্ধুরা! আজ থেকে প্রায় তিন হাজার আটশ বছর আগে পৃথিবীর মানুষেরা যখন আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলো, তখন তারা পৃথিবীর নানা কিছুকে স্রষ্টা ও রক্ষাকারী মনে করে উপাসনা করতো। সেই অন্ধকার অজ্ঞ সময়ের নবী হযরত ইব্রাহীম (আ.) মহান আল্লাহকে কী ভাবে খুঁজে পেলেন, চিনতে পারলেন সে এক জ্ঞানসমৃদ্ধ অভিযান বটে। নবী ইব্রাহীম (আ.) 'এর আল্লাহকে অন্বেষণ এবং সবশেষে মহাসত্য পবিত্র আলোকময় সবকিছুর স্রষ্টা প্রেমময় আল্লাহকে পাওয়ার ঘটনাটি আজও জ্ঞানী ও গবেষক মানুষের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধার সাথে আলোচিত হয়।

তাহলে এবার বলতো মহাসত্য, সর্বশক্তিমান, প্রেমময়, দাতা ও দয়ালু আল্লাহকে খুঁজে পেতে কোন নবী জ্ঞানসমৃদ্ধ চেতনার অভিযান করেছিলেন?

হ্যাঁ, তিনি সেই নবী, যাঁর নাম হযরত ইব্রাহীম (আ.)। আমাদের জন্য মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর কাছে অবতীর্ণ পবিত্র কুরআন শরিফে নবী ইব্রাহীম (আ.) এর কথা মহান আল্লাহুতায়াল্লা বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহুতায়াল্লাকে খুঁজে পেতে নিজের জ্ঞানসমৃদ্ধ চেতনার অভিযান করেছিলেন। যুক্তি ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

নবী হযরত ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহুতায়াল্লা আমাদের কী জানাচ্ছেন?

হ্যাঁ, ঘটনাটি তো আসলে প্রায় আট হাজার তিনশ বছর আগের। মহান আল্লাহুতায়াল্লা আমাদের জানাচ্ছেন, নবী

ইব্রাহীম (আ.) যখন বালক ছিলেন তখন থেকেই তিনি মহান আল্লাহকে খুঁজতেন। চিনতে চেষ্টা করতেন।

কেনো ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহু'র সন্ধানে এতো ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন?

সোনালী বন্ধুরা, নবী ইব্রাহীম (আ.) এর বালক বেলা থেকে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহুতায়াল্লাকে খুঁজে পাওয়া খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। যদিও তিনি নিজে গোটা সৃষ্টিজগত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আল্লাহু'রই সৃষ্টি, কিন্তু এই সত্যকে উপলব্ধির জন্য গভীর জ্ঞানগত অন্বেষণ প্রয়োজন ছিলো। কারণ মহান আল্লাহ বা সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে জানতে না পারা এবং তাঁর উপাসনা করতে না পারা জ্ঞানহীন মানুষের জন্য কতোটা মর্মবেদনার কারণ তা বোঝানো যাবে না। প্রতিটি মানুষই বস্তুতঃ মহাজাগতিক সত্যকে জানতে চায়, চিনতে চায় পৃথিবী ও মহাজগতের স্রষ্টাকে, সেই স্রষ্টার প্রতি মানুষ তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে চায়।

আল্লাহকে খুঁজতে গিয়ে এক চমৎকার রাতের তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ইব্রাহীম (আ.) কী করলেন?

হ্যাঁ, সোনালী বন্ধুরা, রাতটি ছিলো খুবই চমৎকার। আকাশ ছিলো অগণিত হিরের টুকরোর মতো আলোর দ্যুতি ছড়ানো তারায় ভরা। এইসব তারাদের মধ্যে ইব্রাহীম (আ.) একটি বড় উজ্জ্বল দ্যুতিময় তারাকে দেখে খুশি হয়ে গেলেন। ভাবলেন এই তারাটাই বুঝি আল্লাহু। কিন্তু রাত বাড়ার সাথে সাথে তিনি দেখলেন সেই উজ্জ্বল তারাটি কোথায় যেনো উধাও হয়ে গেছে। বালক ইব্রাহীম (আ.) এতে মর্মান্বিত হলেন। তিনি বল্লেন, আমি এই ধরনের বস্তুকে উপাসনা করবো না, যা অস্থায়ী, যার আলো নিশ্চয় হয়ে যায়, যা হারিয়ে যায়।

এরপর নবী ইব্রাহীম (আ.) কী করলেন? কী দেখতে পেলেন?

হ্যাঁ, সোনালী বন্ধুরা, সে কথাই বলছি। ইব্রাহীম (আ.) তারপরও থেমে থাকেন নি। আল্লাহুতায়াল্লাকে খুঁজছিলেনই। তিনি জানতেন, সৎ ও ভালোচিত্তার মানুষেরা যতোক্ষণ না সত্যকে খুঁজে পায়, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের অন্বেষণ অব্যাহত রাখে। একদিন রাতের আকাশে তিনি দেখলেন চাঁদ উঠেছে।

চাঁদের নরোম মিষ্টি আলো ও রাতের আকাশে এর মনোরম সৌন্দর্য দেখে তিনি আনন্দে আপ্ত হলেন। তাঁর মধ্যে উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হলো। তিনি বললেন, 'এটা নিশ্চয়ই আমার আল্লাহ্।' কিন্তু আগের উজ্জ্বল তারার মতো চাঁদও এক সময় মলিন হয়ে আকাশ থেকে উধাও হয়ে গেলো। বালক ইব্রাহীম (আ.) হতাশ হলেন। বললেন, এটা আল্লাহ্ হতে পারে না। তিনি মনে মনে ভাবলেন, মহাসত্য মহান আল্লাহ্ যদি তাঁকে জানার পথ বাতলে না দেন, তাহলে তিনিও ভুল পথে যাওয়া মানুষের মতো হয়ে যাবেন।

**কিন্তু তারপর ইব্রাহীম (আ.) কী করলেন?
আবার তিনি কী দেখলেন?**

দুপুরের প্রখর তেজে আকাশে আলো ছড়ানো সূর্যকে দেখে নবী ইব্রাহীম (আ.) খুব উৎফুল্ল হয়ে ভাবলেন, 'এটাই হবে আল্লাহ্। কারণ এর রয়েছে প্রখর তেজ আর এটি চাঁদ ও তারাদের চেয়ে অনেক বড়।' কিন্তু হায়! তার মন আবারো বিষন্ন হয়ে গেলো। তিনি যখন দেখলেন সন্ধ্যায় সেই প্রখর তেজের সূর্য লান হয়ে ধীরে ধীরে অস্ত গেলো। নবী ইব্রাহীম (আ.) এর চারধার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। নবী ইব্রাহীম (আ.) এই অন্ধকারে টের পেলেন তাঁর মনের ভেতর মহান আল্লাহ্কে জানার, বোঝার এবং সামগ্রিকভাবে উপলব্ধির আলোকশিখা আস্তে আস্তে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে।

**কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবী ইব্রাহীম (আ.)
কী আল্লাহুতায়ালাকে পেলেন?**

হ্যাঁ, সোনালী বন্ধুরা! শেষ পর্যন্ত নবী ইব্রাহীম (আ.) তাঁর অন্তরের গভীর সত্য উপলব্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্কে এবং তাঁর মহাপবিত্র মহা সত্যকে পেলেন। ইব্রাহীম (আ.) বুঝলেন, মহাজগত স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁকে চোখে কখনও দেখা যাবে না। তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক ও স্রষ্টা। তিনি চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্ররাজি, মহাকাশ, পৃথিবী, মানুষ সহ দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা।

**মহান আল্লাহ্কে পাওয়ার উপলব্ধির পর নবী ইব্রাহীম (আ.) কী
বললেন?**

মহান সত্য আল্লাহ্কে সবশেষে উপলব্ধির পর নবী ইব্রাহীম (আ.) বললেন এই চাঁদ, সূর্য, পাথরখণ্ড, নানা রকম ত্রিমাত্রিক নিষ্প্রাণ বস্তু ও অবয়বগুলো আমার স্রষ্টা নয়। আমি এদের

ইবাদত বা উপাসনা করি না কারণ এই বস্তুগুলো অস্থায়ী, মহান স্রষ্টার আদেশ ও নিয়মের অধীন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) অতঃপর বললেন, 'ঐসব বস্তু আমার স্রষ্টা নয়। মহান আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। ঐসব বস্তুগুলো আমার ক্ষুধার সময় খাদ্য দিতে পারে না। কিন্তু আমার খাদ্য আসে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। আমি অসুস্থ হলে ঐসব বস্তু আমাকে সুস্থ করতে পারে না। কিন্তু মহান আল্লাহ্ই আমাকে সুস্থ করতে পারেন। আমি সেই মহান একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করি যিনি বেহেশত, পৃথিবী এবং আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁর সাথে কাউকে শরিক করি না। আমি অন্য কোনো খোদারও উপাসনা করি না। আমি তাঁকে দেখি না, কিন্তু তিনি আমাকে সব সময় দেখতে পান, আমি যেখানেই থাকি না কেনো। তিনি সবকিছুকেই সবসময় দেখতে পান। তিনি সর্বশক্তিমান।'

**তাঁর মধ্যে উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হলো। তিনি বললেন,
'এটা নিশ্চয়ই আমার আল্লাহ্।' কিন্তু আগের
উজ্জ্বল তারার মতো চাঁদও এক সময় মলিন হয়ে
আকাশ থেকে উধাও হয়ে গেলো। বালক
ইব্রাহীম (আ.) হতাশ হলেন। বললেন, এটা
আল্লাহ্ হতে পারে না। তিনি মনে মনে ভাবলেন,
মহাসত্য মহান আল্লাহ্ যদি তাঁকে জানার পথ
বাতলে না দেন, তাহলে তিনিও ভুল পথে যাওয়া
মানুষের মতো হয়ে যাবেন।**

অতঃপর নবী ইব্রাহীম (আ.) তাঁর সময়ের সব মানুষকে আল্লাহ্কে পাওয়ার কথা, তাঁর সত্য খুঁজে পাওয়ার কথা জানিয়ে বললেন, আল্লাহুতায়ালাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমরা আল্লাহুতায়ালার সাহায্য চাই, তিনিই আমাদের জন্য একমাত্র সত্যপথ প্রদর্শনকারী।

প্রিয় সোনালী বন্ধুরা নবী হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর মতো আমরাও মহান ও একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করবো। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবো না। পরম দয়ালু আল্লাহ্কে পাওয়ার ক্ষেত্রে নবী হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সত্যদর্শন ও সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা মহান আল্লাহুতায়ালার আমাদেরকেও দান করুন, এই দোয়া আমরা সবাই সব সময় করবো। আমিন।

পাঠক পর্যবেক্ষণ

যুগ ও জাগতিক সংকট এবং ফিকাহবিদ ফকিহদের লাগাতার নিরবতা

একবিংশ শতাব্দীর শুরু হওয়ার পর এই নতুন শতাব্দীর উনিশ বছর সময়কাল অতিক্রান্ত হতে চলেছে। বিশ্বজুড়ে সকল ধর্ম, মত ও পথের মানুষের যুগযন্ত্রণা ও জাগতিক সংকট মনে হয় আরো বল্গুণ বেড়েছে। তাসাওউফের আত্মিক শক্তিবহীন নিঃসঙ্গ শরিয়তের পথ ধরে যারাই হাঁটতে গেছেন, তারাই প্রচণ্ড হেঁচট খেয়েছেন। অথচ তুরিকত-শরিয়ত সবকিছুর মেলবন্ধনেই একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক এই প্রার্থনা শুধু মুসলমানরাই নয়-শান্তিকামী পৃথিবীর নানা ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষেরাই করে। আমাদের দেশের সব বিশ্বাসের মানুষেরাও তাই করেন। সকল ধর্মেরই শরিয়ত বা বাহ্যিক বিধি বিধান আছে, আবার তুরিকত বা আধ্যাত্মিক চর্চাও আছে। বিজ্ঞানের পদার্থবিদ্যার পাশাপাশি মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যাও মানুষের অধ্যাত্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদকে অবলম্বন করে বিশ্বজুড়ে সাহিত্য ও জীবনবোধ তৈরি করার চেষ্টা করছে। তথাপি দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশ, আশেপাশের সমাজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বল্গুণী অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। সেটা বিশ্বের নানা দেশে এই অবক্ষয় নানারূপে আত্মপ্রকাশ করছে। নতুন শতাব্দীতে পৃথিবীব্যাপী শুধু মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ই নয়, বরং পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্যও কেমন যেনো টালমাটাল হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন, আমাজন অরণ্য আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করা, পৃথিবীর মেরু অঞ্চলগুলোর বরফ গলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি। রোগ-ব্যাদি, মহামারী বিস্তার, ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি বিপর্যয় যেনো ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি ও গৌরব এতোসব মানবিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে ক্রমশঃ ভীতি উৎপাদন করছে, কোনো সাস্ত্রনা দিতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না।

বিগত শতাব্দীতে তো দেশে-বিদেশে যুদ্ধ বিগ্রহ কম হয় নি। কিন্তু একুশ শতক শুরু হতে না হতেই এই হানাহানি যেনো আরো ভয়াল রূপ পেয়েছে। মুসলমানদের বহুদেশ ধ্বংসের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছে। মুসলিম নারী ও শিশুরা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে করুণ মানবিক বিপর্যয়ের শিকার। এই দুঃসময়ে ঘন অন্ধকারে মুসলিম ধর্মবোদ্ধা ফকিহ এবং নানা প্রতিষ্ঠানের গ্র্যাণ্ড মুফতিগণ নীরব, বিচ্ছিন্ন। তাদের যেনো কোনো দিক-নির্দেশনা নেই।

আমাদের দেশেও নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যানবাহনে, অফিস-আদালতে, নারী-শিশুদের সাথে পৈশাচিক ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব যে আগেও ছিলো না তা নয়। কিন্তু এখন যেনো তা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। তারপর মানবিক-সাম্য, ধর্মীয় অধিকার, বিশ্বাস করার অধিকার, বিশ্বাস সম্পর্কে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার প্রীতিপূর্ণ উপায় সব পথই যেনো অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। সমাজের অর্ধেক অংশ নারী, তারা ঘরের বাইরে আয়-রুজিতে আসবেন, কিন্তু তাদের জন্য যেসব বাধা তা যুগের প্রয়োজনে নতুন ব্যাখ্যায় নতুন যুক্তিতে ফকিহগণ বা ফিকাহশাস্ত্রবিদগণইতো দূর করবেন।

কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আচরণ নিয়েও নিদারুণ বগড়াবিবাদে আছি। কিন্তু শান্তির স্বার্থে এই আচরণের বিবাদ নিরসনের যুক্তি নিশ্চয়ই থাকা চাই। ফকিহদের হাতে সেই সুযোগ যখন আছে; তারা যদি তা কাজে না লাগান, কাল হাশরের ময়দানে তাঁরা আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবেন? আমাদের শিশুদের একটি বিরাট অংশ পারিবারিক শিক্ষা এবং শৈশবের প্রত্যুষকালীন ধর্মীয় শিক্ষা থেকে আধুনিক শিক্ষার ভয়ানক চাপে ও টানাহেঁচড়ায় কী ভাবে দূরে সরে যাচ্ছে তারও সমাধান কী ফিকাহশাস্ত্রবিদরা দিতে পারেন না? অথচ সাধারণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম শিশুদের পিঠ থেকে অপ্রয়োজনীয় বইয়ের বোঝাকে নামানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

আমরা তো জানি ফিকাহ হচ্ছে ইসলামি আইনশাস্ত্র। যা অধ্যয়নের মাধ্যমে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল বিষয়ে ইসলামি শরিয়তের যুগোপযোগী বিধান আনতে পারেন। তার একটি প্রায়োগিক রূপও তাঁরা তৈরি করতে পারেন। ফিকাহ'র উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন, হাদিস শরিফ, ইজমা এবং কিয়াস। ইসলামি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত উলামা কিরামগণ বলেন, ইজমা অর্থ কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছা। ইজমা যে শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস তা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত। আর তা বাস্তবরূপ পেতে পারে ইসলামি আইনবিদগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে। রাসূল (দ.) এর ওফাতের পর যে কোনো বিষয়ে ইজমা হতে পারে। ইসলামি স্কলাররা বলেন, ইজমা'র অবস্থান হাদিসের পরে।

কিন্তু শান্তির স্বার্থে এই আচরণের বিবাদ নিরসনের যুক্তি নিশ্চয়ই থাকা চাই। ফকিহদের হাতে সেই সুযোগ যখন আছে; তারা যদি তা কাজে না লাগান, কাল হাশরের ময়দানে তাঁরা আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবেন? আমাদের শিশুদের একটি বিরাট অংশ পারিবারিক শিক্ষা এবং শৈশবের প্রত্যক্ষকালীন ধর্মীয় শিক্ষা থেকে আধুনিক শিক্ষার ভয়ানক চাপে ও টানাহেঁচড়ায় কী ভাবে দূরে সরে যাচ্ছে তারও সমাধান কী ফিকাহশাস্ত্রবিদরা দিতে পারেন না?

আলেমগণ বলেন, দু'টি বিষয়ের বাহ্যিক ও অর্থগত সামঞ্জস্য বিধানকে কিয়াস বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ সমাজ জীবনে এমন একটি নতুন বিষয় এসেছে যার বিধান পবিত্র কুরআন ও হাদিসে প্রত্যক্ষভাবে নেই। কিন্তু এই নতুন বিষয়টির মতো আরেকটি বিষয়ের সমাধান কুরআন-হাদিসে আছে। এই সামঞ্জস্যের বিষয়টি তুলে এনে অনুল্লিখিত বিষয়ের সমাধান সেখান থেকে গ্রহণ করাকে কিয়াস বলে। কিয়াসের অবস্থান ইজমা'র পরে। কাজেই আজ প্রযুক্তিনির্ভর সংকটসংকুল জীবনে মুসলমান নর-নারী তথা সর্বস্তরের মানুষ সামাজিক কল্যাণে জীবনের নতুন সংজ্ঞা পেতে পারেন ফকিহদের কাছ থেকে। ইসলাম তো যুগোপযোগী জীবনের দিক-নির্দেশনা দেয়ার সুযোগ রেখেই দিয়েছে। ফকিহগণ শুধু দৈনন্দিন জীবন কেনো, তাসাওউফ ও ত্বরিকত সমৃদ্ধ নৈতিক জীবনেরও দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন তাদের অর্জিত জ্ঞানের আলোকে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

মাসিক আলোকধারা'র সম্মানিত পাঠকগণ এখন থেকে 'পাঠক পর্যবেক্ষণ' কলামে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত পাঠাতে পারবেন। এতে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবিক-সামাজিক সমস্যা ও যৌক্তিক সমাধানপূর্ণ মতামতকে স্বাগত জানানো হবে। লেখা সম্পাদকীয় দপ্তরে
e-mail:
sufialokdhara@gmail.com -এ
পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সুফি উদ্ধৃতি

- ইবাদত ও রিয়াযতের সর্ববিধ চেষ্টা শেষ করে আল্লাহুতা'য়ালার মেহেরবানীর উপর ভরসা করা উচিত, নিজের আমলের উপর নয়।
- দোষখের আগুন তাদের জন্যই আজাব, যারা আল্লাহকে চিনে না। যারা আল্লাহুতা'য়ালাকে চিনে তাঁরা দোষখের জন্য আজাব স্বরূপ হবে।
- যে ব্যক্তি নফসের যাবতীয় কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে পেরেছে, সে আল্লাহুতা'য়ালার সাথে মিলিত হতে পেরেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহুতা'য়ালার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করেছে, সবকিছুই তাঁর হয়ে যায়। কারণ আল্লাহুতা'য়ালার সর্বত্র বিদ্যমান, আর সব বস্তুই আল্লাহুতা'য়ালার।
- যিনি আল্লাহুতা'য়ালার মা'রিফাত লাভ করেছেন, তিনি নিজেকে মূর্খ ও অজ্ঞ বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহুতা'য়ালার সম্বন্ধে কিছুই জানে না, সে বলে বেড়ায় আমি 'আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞানী' আরেফ লোক উড্ডীয়মান পাখির মত। আর যাহেদ (সংসার ত্যাগী) ভবঘুরে যুবকদের ন্যায়।
- সমুদয় সৃষ্টির জন্য যত নেয়ামত নির্ধারিত আছে, তা যদি তোমাকে দেয়া হয় তথাপি তুমি তার প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। আর যদি ত্বরিকতের পথে সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্য তোমার উপর আসে তথাপি তুমি নিরাশ হবে না। কেননা আল্লাহুতা'য়ালার কাজ তাঁর ইঙ্গিত হওয়া মাত্রই অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায়, তোমার সমস্ত দুর্ভোগ এক মুহুর্তে সৌভাগ্যে রূপান্তর হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।
- যে ব্যক্তি নিজেকে কিছু মনে করে, নিজের ইবাদতকে খাঁটি এবং নিজের অন্তরকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার বলে মনে করে, আর নিজের নফসকে সমস্ত নফসের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে মনে করে না, সেই ব্যক্তি কোন গণনাতেই আসে না।
--- হযরত বায়জীদ বোস্তামী (রহ.)



শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

০১. মাদ্রাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী,
মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০২. উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হিফযখানা,
মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০৩. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইনস্টিটিউট (দাখিল),
পশ্চিম গোমদভী ৯নং ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
০৪. গাউসিয়া কলন্দরীয়া নঈমীয়া মাদ্রাসা হেফজখানা ও এতিমখানা,
বেতছড়ি ১নং ওয়ার্ড, ১৩নং ইসলামপুর, ঠাণ্ডাছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
০৫. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্কুল,
শান্তিরদ্বীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
০৬. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী হিফযখানা ও এতিমখানা,
হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
০৭. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)
ইসলামি একাডেমি, হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
০৮. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ইবতেদায়ী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
০৯. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা,
হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
১০. মাদ্রাসা শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মনোহরদী, নরসিংদী।
১১. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব লালানগর, ছোট
দারোগার হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১২. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৩. মাদ্রাসা-ই জিয়া মওলা হক ভাণ্ডারী,
পশ্চিম ধলই (রেল-লাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৪. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৫. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী, বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১৬. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৭. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী,
খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৮. জিয়াউল কুরআন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
চরখিজিরপুর (ট্যাক্সঘর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২০. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
এয়াকুবদভী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।

২২. হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্রাসা, নূর আলী মিয়ায় হাট,
ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৩. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২৪. শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পশ্চিম ধলই (রেললাইন সংলগ্ন),
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৫. বাইত-উল-আসফিয়া, মাইজভাণ্ডারী খানকাহ্ শরিফ,
খাদেম বাড়ি (৩য় তলা), বাড়ি # ৪, ব্লক # ক, মিরপুর হাউজিং
এস্টেট, উত্তর বিশিল, থানা-শাহ্ আলী, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

- শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল
“সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প”:
- হোসাইনী দাতব্য চিকিৎসালয় ও খতনা সেন্টার
মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ নুরুল বখ্তেয়ার শাহ্ (রঃ) দাতব্য চিকিৎসালয়
গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্ শরিফ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম
- জামাল আহমদ সিকদার দাতব্য চিকিৎসালয়
স্টীলমিল বাজার, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
- হযরত আকবর শাহ্ (রঃ) দাতব্য চিকিৎসালয়
ইস্পাহানী ‘সি’ গেইট, আকবর শাহ্, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ ছালেকুর রহমান শাহ্ (রঃ) দাতব্য চিকিৎসালয়
ধামাইরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
- শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী (কঃ) দাতব্য চিকিৎসালয়
আজিমপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (রঃ) দাতব্য চিকিৎসালয়
মানিকপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- যাকাত তহবিল
- দুস্থ সাহায্য তহবিল

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
- আলোকধারা বুকস
- মাসিক আলোকধারা

আত্মোন্নয়নমূলক যুব সংগঠন:

- তাজকিয়া

মহিলাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন:

- আলোর পথে
- দি মেসেজ

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী
 - মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন
- ### জনসেবা প্রকল্প:
- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
 - দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী ও ইবাদতখানা, নাজিরহাট তেমেহনী রাস্তার মাথা।
 - দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, শান-ই-আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে

- ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ),
ভ্রাম্যমাণ ওয়ুখানা ও টয়লেট।

THE MONTHLY ALOKDHARA REGD. NO CHA-272 PRICE : 15.00

বাংলার পবিত্র জমিনে প্রবর্তিত একমাত্র তুরিকা, তুরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীয়ার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্রপৌত্র ও অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোকারা হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্রথম পুত্র বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ৩১তম উরস শরিফ উপলক্ষে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট (SZHM Trust)-এর উদ্যোগে

৭ দিনব্যাপী কর্মসূচি ২০১৯

তারিখ ও বার	অনুষ্ঠান	ব্যবস্থাপনা
৪ অক্টোবর ২০১৯ শুক্রবার	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, কেন্দ্রিয় পর্যদ নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা কমিটি সমূহের ব্যবস্থাপনায় স্ব স্ব এলাকার মসজিদে কুরআন তেলাওয়াত ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় পর্যদ
৫ অক্টোবর ২০১৯ শনিবার	'একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ও মুসলিম উম্মাহ' শীর্ষক সেমিনার সময় : বিকাল ৫টা ভেন্যু: জেলা পরিষদ মিলনায়তন, চট্টগ্রাম।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
৬ অক্টোবর ২০১৯ রবিবার	ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) জীবনী আলোচনা, র্যালি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানমালা	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ
৭ অক্টোবর ২০১৯ সোমবার	ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ ও প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নীতি নৈতিকতা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় আলোচনা	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ
১০ অক্টোবর ২০১৯ বৃহস্পতিবার	ফটিকছড়ি উপজেলার রেজিস্টার্ড এতিমখানায় ছাত্র-ছাত্রীদের একবেলা খাবার সরবরাহ	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট ও গাউসিয়া হক মন্ডল
১১ অক্টোবর ২০১৯ শুক্রবার	ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্বলিত দুর্লভ চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী, উপদেশমূলক, দিক-নির্দেশনা সম্বলিত প্রচার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট ও গাউসিয়া হক মন্ডল
১২ অক্টোবর ২০১৯ শনিবার	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি সময় : সকাল ৬টা	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট ও গাউসিয়া হক মন্ডল